আমাদের সংগ্রাম

পরবশ্যতার বিরুদ্ধে

অপশিক্ষার বিরুদ্ধে

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে

হঠকারিতার বিরুদ্ধে

শত্রুর বিরুদ্ধে

হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে

ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে

কলিকাতা প্রকাশক সমবায় সমিতি লিঃ

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রদত্ত পাঠক্রম অনুসারে পঞ্চম শ্রেণীর
'দ্রুত পঠন' (মাতৃভাষা) হিসাবে রচিত

আমাদের সংগ্রাম

(পঞ্চম শ্রেণীর জন্য)

Acc. No — 15046

ডঃ নীরদবরণ হাজরা, এম, এ, (বি. টি), পি-এইচ ডি.
প্রাক্তন শিক্ষক : নবদ্বীপ বকুলতলা উঃ মাঃ বিদ্যালয় ; রাণাঘাট
লালগোপাল উঃ মাঃ বিদ্যালয়।
প্রাক্তন সংযুক্ত সম্পাদক : নবম-দশম, কিশোরমন। ভাষা বিচিত্রা,
বাঙলা ভাষার রূপ-রীতি ও প্রয়োগ ইত্যাদি বহু
বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থের রচয়িতা
আবৃত্তি কোষ, ভাষণ কোষ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—
অভিধান ইত্যাদি নানা গ্রন্থ প্রণেতা।

কলিকাতা প্রকাশক সমবায় সমিতি লিঃ
রেঃ অফিস : ৩১এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯
কার্যালয় : ৭৭ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

সূচীপত্র

আমাদের সংগ্রাম

প্রকাশক : কলিকাতা প্রকাশক সমবায় সমিতির প.ক্ষ, সম্পাদক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভৌমিক।

গ্রন্থস্বত্ব : শ্রীমতী লেখা হাজরা। অঙ্গনা। কৃষ্ণনগর।

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৮৬

মুদ্রাকর :
লক্ষ্মী প্রিন্টার্স
শ্রীগণেশকুমার ভাণ্ডারী
২১/১ বি. পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা—৯

মূল্য : সাত টাকা মাত্র

ভূমিকা

দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ আমাদের শিশুদের স্বাধীনদেশের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলবার গুরু দায়িত্ব শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকলের। এ বিষয়ে শিক্ষার পরিকল্পনাকার থেকে গ্রন্থলেখক বা প্রকাশক, অভিভাবক থেকে শিক্ষক সকলেরই বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। শিক্ষাকর্মী হিসাবে আমি এ সত্যে বিশ্বাস করি এবং আমি আজীবন এ বিষয়ে কাজ করে এসেছি। আমার সেই-প্রত্যয় ও অভিজ্ঞতা নিয়েই আলোচ্য গ্রন্থের পরিকল্পনা ও গ্রন্থনা করেছি।

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার সমালোচনা করে বলেছিলেন যে সে শিক্ষার সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল এই যে, তা দেশ ও জীবনের গভীরে নিয়ে যেত না শিক্ষার্থীকে। একটা স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর মনে দেশ ও জীবন গভীরভাবেই প্রবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কৌতূহল ও আনন্দ হবে তার সহায়। তবেই তার শিক্ষা সাঙ্গীকৃত হবে।

এই তত্ত্ব ও সত্যগুলিতে আস্থা রেখেই আলোচ্য গ্রন্থ পরিকল্পিত হয়েছে। এ যুগে—সকল মানুষেরই সবচেয়ে বড় শ্লোগান 'আমাদের সংগ্রাম—চলছে, চলবে।' আমরাও বলছি, সেই অনাদি কাল থেকেই ত' মনুষ্যত্বের সংগ্রাম চলছেই। আমরা সংগ্রাম করে চলেছি পরবশ্যতা, অপশিক্ষা, কুসংস্কার, হঠকারিতা, শত্রুতা, হৃদয়হীনতা, অস্পৃশ্যতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে। এ সব সংগ্রামের কথা ছড়িয়ে আছে সমস্ত ধর্মগ্রন্থ। আমি সকল সম্প্রদায়ের গ্রন্থ থেকে সশ্রদ্ধায় ঐ সব গল্প সংগ্রহ করেছি। এর ফলে শিক্ষার্থী শুধু গল্পগুলিই জানবে না, আমরা যুগ-ও জাতি নির্বিশেষে যে মনুষ্যত্বের সংগ্রাম করছি, সেই ঐতিহ্যে আস্থাবান হবে। আর সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীর মন যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বিমুক্ত হয়ে উদার অসাম্প্রদায়িতার মুক্ত আকাশে বিহার করবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

কলকাতা প্রকাশক সমবায় সমিতি এ গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে তাদের শিক্ষা-মনস্কতা এবং প্রগতিচিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। এখন শিক্ষক শিক্ষিকাগণ আমাদের পরিকল্পনাকে সমর্থন করে শিক্ষার্থীদের হাতে গ্রন্থটি তুলে দিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।
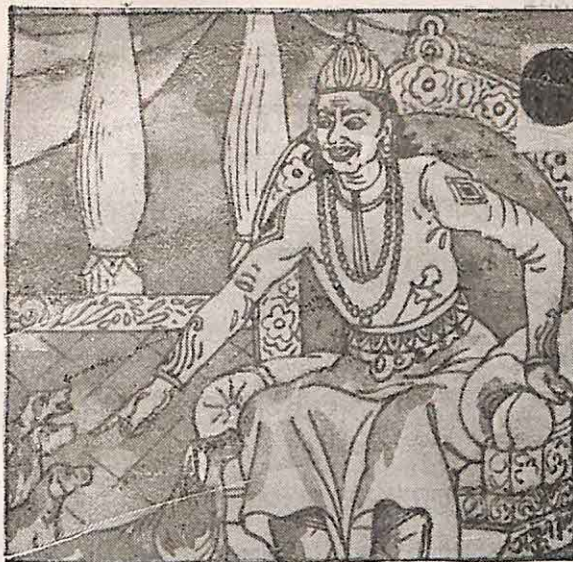
স্বর্গরাজ্যে দিনটা শুরু হ'ল হাহা-কারের মধ্য দিয়ে।

গভীর রাত্রে কে বা কারা স্বর্গের সমস্ত গোরু চুরি করে নিয়ে গেছে। এমন ভাবে চুরি করেছে যে কেউ জানতে পারেনি তাদের কীর্তি, এতটুকু শব্দ হয়নি। এমন কোথাও একটা গোরুর পায়ের ছাপ পর্যন্ত নেই। যেন কোন জাদুবলে গোরু-গুলো উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

গোরু যে এত প্রয়োজনের তা বোঝেন নি দেবতারা। গোরু যেতেই বন্ধ হয়ে গেছে দুধের যোগান। শিশুরা হাহাকার করছে, ক্ষীর-সর-ছানা দৈ-মাখন ঘি আর এ সব দিয়ে তৈরী শত শত রকম মিষ্টান্ন আর তৈরী হচ্ছে না। স্বর্গরাজ্যের কারোরই মুখে রুচছে না কিছু। কোথায় আমোদ আহ্লাদ। গোটা স্বর্গরাজ্যের গোরু নয়—প্রাণটাই চুরি গেছে।

স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র চুপ করে বসে আছেন সিংহাসনে। তার বিশ্বজয়ী সৈন্য-দল প্রস্তুত হয়ে আছে যুদ্ধ যাত্রার জন্য। কিন্তু কার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবে তারা!
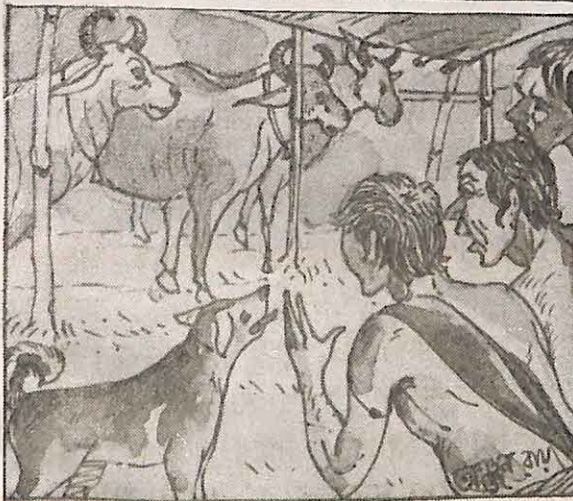
চোরেরা কোন চিহ্নই যে রেখে যায়নি যে তার থেকে চেনা যাবে তাদের। দেবতারা সকলেই বিভ্রান্ত বিমূঢ়। কোন্ সূত্র ধরে বের করা যায় গোরুচোরদের সন্ধান।

ইন্দ্রের হঠাৎ মনে পড়ল স্বর্গের কুকুরদের কথা। ঘ্রাণশক্তি বলে অসাধ্য সাধন করতে পারে তারা। ইন্দ্র কুকুরদের প্রধানকে ডাকলেন।

কুকুর প্রধান এসে দাঁড়াল ইন্দ্রের সামনে। অভিবাদন করে বলল, হে স্বর্গরাজ! বলুন কি আদেশ।

ইন্দ্র বললেন, তোমরা চোরেদের খুঁজে বের কর।

হো হো করে হাসল কুকুর প্রধান। বলল, কেন দেবরাজ, গোরু হারানতে কি এমন ক্ষতি হয়েছে আমাদের? এতদিন যে আমরা এত সতর্ক হয়ে পাহারা দিয়েছি, এত তৎপর হয়ে সব বিপদের কথা জানিয়ে দিয়েছি আগে-ভাগে তার প্রতিদানে কি পেয়েছি?

ইন্দ্রের মনে পড়ল, আনন্দ আর উল্লাসের স্রোতে সত্যিই তারা কুকুরদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছেন। এত দুধের স্রোতের ছিটে-ফোটাও দেন নি তাদের। তাদের কথা মনেও হয়নি। মাথা নিচু করলেন দেবরাজ। বললেন, তোমার অভিযোগ সত্য। সত্যিই তোমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। আমি অনুতপ্ত কুকুর সর্দ্দার।

কুকুর সর্দ্দার বললে, আপনাদের দুর্দ্দশায় আমরাও আনন্দিত দেবরাজ। জানবেন সব কাজেরই যোগ্য ফল আছে। এতদিনের অবহেলার পর আমরা ডাকা মাত্রই আপনার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব, এ কথা আজ আর ভাববেন না।

দেবরাজ কুকুর সর্দ্দারের কথায় চমকে উঠলেন। তারপর তাকালেন অন্য কুকুরদের দিকে। বললেন, তোমরাও কি কেউ আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না!

কুকুরেরা সকলেই চেঁচিয়ে উঠল, না না।

এক কোণে শুয়ে শুয়ে সব কথা শুনছিল কুকুরের আদিমাতা সরমা। দেবতাদের এই বিড়ম্বনায় খুশিই হচ্ছিল সে। এতদিন তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে সবটুকু ভোগ করছে দেবতারা। এতটুকুও দেয়নি তাদের। আজ বুঝুন বঞ্চনার বেদনা।

এমন সময় কোথায় কেঁদে উঠল স্বর্গের কোন শিশু। সাথে সাথে মুসড়ে উঠল সরমার বুক। আসলে তো মা সে। সইতে পারবে কেন শিশুর বেদনা। আর সত্যিই তো, ওই শিশুরত' কোন অপরাধ নেই। আর সত্যি যদি অপরাধ থাকেও, কিছু লোকের অপরাধের জন্যত' গোটা দেশকে তো আর শাস্তি দেওয়া যায় না। দেশত' অপরাধ করেনি। বরং বাতাস দিয়ে, আহার দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে স্বদেশই তো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। শিশুটির কান্না সরমার মধ্যে নতুন করে একটা আবেগ

সৃষ্টি করল। সে মনে মনে বলল, হে আমার স্বদেশ, আমার মা ! আমি তোমার অধম সন্তান। তোমার এই বিপদের দিনে, আমি চুপ করে বসে থাকতে পারব না। আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি তোমার হৃত ঐশ্বর্য ফিরিয়ে আনব।

ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়াল সরমা। এগিয়ে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রের সামনে। বলল, দেবরাজ ! আমি দেব তোমাকে সেই চোরদের সন্ধান !

কুকুরেরা চিৎকার করে উঠল, এ কি বলছ মা ! আমাদের সকলের বিরুদ্ধে একা তুমি ঐ দেবতাদের সাহায্য করবে ? ওরা এতদিন আমাদের স্বর্গের ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করে নি ?

সরমা বলল, আমাকে ভুল বুঝোনা বাছারা। আমি আসলে ইন্দ্রকে সাহায্য করছি না। দেখছ না, গোরু চুরি যাওয়ায় দুধের অভাবে গোটা স্বর্গপুরী কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। আমি দেশের এ দুর্দ্দশা সইতে পারছি না। আমি চলেছি স্বদেশকে সাহায্য করতে।

কুকুররা বলল, তোমার মতিভ্রম হয়েছে। স্বদেশের নাম করে তুমি অত্যাচারী ইন্দ্রকে সাহায্য করতে চলেছ। তুমি আমাদের মা হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছ ! ধিক্ তোমাকে।

সরমা বলল, তোমাদের ধিক্কার মাথায় তুলে নিলাম বাছারা। একটা দিন আসবে যেদিন বুঝবে আমি যা করেছি তা স্বদেশের জন্যই করেছি। সেদিন বুঝবে, সব দল, সব মত আর সব স্বার্থের চেয়ে অনেক বড় স্বদেশ। স্বদেশের মঙ্গলেই সবার মঙ্গল।

ইন্দ্র সোল্লাসে বলে উঠলেন, তুমি যথার্থই বলেছ সরমা। স্বদেশের চেয়ে আর বড় কিছু নেই। তোমার কথায় আমার বুকে আশা জাগছে, আমরা নিশ্চয় এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাব। আর আজ আমি এইদের সভায় দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করছি যদি তুমি গোরু চোরদের সন্ধান এনে দিতে পার, তবে আমরা গোরু উদ্ধার করে তোমার সন্তান-সন্ততিদের দুধের একটা ভাগ চিরকাল নির্দ্দিষ্ট করে রাখবে।

শুনে হাসলেন সরমা। বলল, লোভ দেখাবেন না দেবরাজ। আমি আমার সন্তান-সন্ততিদের ধিক্কারকেও উপেক্ষা করেছি, আপনার দেওয়া প্রলোভনকেও ঠিক তেমনি উপেক্ষা করছি। আমি যা করতে চলেছি তা শুধুই দেশের মঙ্গলের জন্য।

এই বলে সরমা বেরিয়ে পড়ল।

কত কত দিন পার হয়ে যায়। রোদ-জল-ঝড়-বৃষ্টি-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-সব কিছু উপেক্ষা করে গোরু চোরদের খুঁজে চলেছে সরমা। পার হয়ে চলেছে কত খাল-বিল-পাহাড়

পর্বত নগর-প্রান্তর। কিন্তু কোথায় সেই স্বর্গ-সুরভির দল। সর্বত্র যায় সরমা আর তার সমস্ত ঘ্রাণশক্তি উদগ্রীব করে শোঁকে মাটি আর বাতাস। কিন্তু নেই, কোথাও নেই গোরুদের গন্ধ। কারা যেন মায়াবলে ত্রিভুবন থেকে গোরুদের সমস্ত রকম চিহ্নের সঙ্গে ঘ্রাণকেও লুপ্ত করে দিয়েছে।

ক্লান্ত হয়ে পড়ে সরমা। মনটাও ভেঙ্গে যায়। তবে কি পূর্ণ হবে না তার হৃদয়ের বাসনা! স্বদেশকে কি আবার প্রাণবন্যায় ভাসিয়ে দিতে পারবে না সে? তার সব উদ্যম কি ব্যর্থ হবে?

সমস্ত দেহে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চিন্তাটাকে ঝেড়েফেলে সরমা। সফল তাকে হতেই হবে। তার সফল হওয়ার ওপর নির্ভর করছে স্বদেশের মঙ্গল। নিষ্ঠা আর সততা নিয়ে কাজ করলে সাফল্য আসবেই। উৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন সরমা।

পাহাড়ী পথ বেয়ে ওঠতে থাকে সরমা। নাক ফুলিয়ে বারবার নিশ্বাস নেয়। মাটিতে মুখ নামিয়ে শুঁকে। কান আরও খাড়া করে রাখে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। বহুদূর থেকে যেন অনেকগুলি গোরুর আওয়াজ ভেসে এলো! হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছে তার কান। কাছেই কোথাও আছে গরুরা।

আবার ভাল করে মাটি শুঁকে সরমা। হ্যাঁ, এখানেই মাটির তলায় বা পাহাড়ের গর্তে আছে গোরুরা। গোমাতা সুরভির গন্ধটা স্পষ্ট বুঝতে পারে সরমা। কিন্তু কোথায় সে! কোথায় অন্য গোরুরা। সরমা মাটি শুঁকে শুঁকে পাক খায়। ছুটে যায় পাহাড়ের চূড়ায়, পার হয় গিরি সংকট, অতিক্রম করে উপত্যকা। কিন্তু খুজে পায় না গোরুদের। কে যেন মায়াবলে আড়াল করে রেখেছে তাদের। সরমা সেখানেই পড়ে থাকে।

এমন সময়ে একদিন সেখানে এসে হাজির হল একদল মানুষ। গাধার পিঠে চাপানো তাদের বোঝা। তাদের কথা থেকে সরমা বুঝল, এরা একদল বণিক। এদের নাম পণি। বাণিজ্যই এদের জীবিকা। পুবদিকে যে পাহাড় তার তলায় যে শীতল বন, তারই ছায়ায় এদের বসতি। পাহাড়ে দক্ষিণে যে সমতল ভূমি, সেখানে চাষ করে এরা, তারও দক্ষিণের সমুদ্রে এরা করে প্রমোদ বিহার।

পণিরা পথের পাশে সরমাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। স্বর্গের কুকুরের রূপই আলদা। পণিরা একবার এ কোলে নেয়, একবারও এ যদি গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় তবে, ও তার মুখে দেয় চুমু। এ যদি খেতে দেয় এক হাতা অন্যে এনে ঢেলে দেয় এক হাড়ি। সরমা তাদের পরম আদরের বস্তু হয়ে উঠল।

পণিদের দেশে সরমার অবাধ বিচারণ। কিন্তু গোরুরা কোথায়! এরাই যে গোরু চুরি করেছে সেবিষয়ে সরমা নিশ্চিত। সে শুধু গোরুদের গন্ধ পায়নি, শুধু তাদের ডাকই শোনে নি, সে স্বচোক্ষে দেখছে এদের দেশে দুধের ঘটা। দেখছে ক্ষীর-মাখন-ছানার ছড়াছড়ি। ওরা যে সরমাকে তার ভাগ দেয় না তাও নয়। কিন্তু স্বর্গ শিশুদের কথা মনে করে সরমা তার এক বিন্দুও মুখে তুলতে পারে না।

এখন সরমার একমাত্র লক্ষ্য হল গোরুদের রাখবার গুপ্তস্থান খুঁজে বের করা। সে পণিদের সঙ্গে ঘুরতে থাকল। সে তাদের সঙ্গে গেল হাটে, বাজারে। পণিরাজ্যের বাড়ি বাড়ি ঘুরল সে। অবশেষে একদিন একজন তাকে নিয়েই হাজির হ'ল গোপন গোশালায়।

সরমা দেখে অবাক হয়ে গেল, এই সেই পাহাড় যেখানে সে প্রথম গোরুদের গন্ধ পেয়েছিল। পণিরা পাহাড় কেটে এমন ভাবে গোশালা বানিয়েছে যে বাইরে থেকে বুঝবারই উপায় নেই। কাটা পাথর দিয়েই দরজা করেছে তারা। এ জন্যই কাছাকাছি এসেও গোরুদের সন্ধান পায়নি সরমা।

এখন সেই গোরুদের দেখেই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল সরমা। তাকে দেখে গোরুরাও চেঁচিয়ে উঠল। গোমাতা সুরভি তো কেঁদেই ফেলল।

পণিরা অবাক। তারাও তাকাল সরমার দিকে। জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার! তোমাকে দেখে ওরা চেঁচাল কেন? সুরভি কাঁদল কেন? তোমরা কি পূর্ব-পরিচিত?

সরমা বলল, হ্যাঁ। আমি স্বর্গের সারমেয় মাতা সরমা। আমি ইন্দ্রের আদেশে হারান গোরুদের খুঁজতে বেরিয়েছি। এতদিনে হয়েছে আমার কার্যসিদ্ধি। এবার আমি স্বর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব।

পণিরা বলল, সে যে অনেক দূরের পথ। মাঝে অনেক পাহাড়, অনেক নদী, অনেক সমুদ্র।

সরমা বলল, তাতে আমি ভয় পাই না। স্বদেশের নাম করে আমি অনেক পাহাড় ডিঙ্গাব, অনেক নদী-সমুদ্র পার হব।

পণিরা বলল, কিন্তু সেখানে তুমি যাবেই বা কেন? কে সেখানে তোমাকে আদর করে? কে তোমাকে সেখানে দেয় দুধ ও অন্য খাদ্যের ভাগ।

সরমা থমকে গেল। মনে পড়ল স্বর্গের অনাদরের দিনগুলির কথা। মনে পড়ল পণিদের সমাদর। তবু লোভ ঝেড়ে ফেলল সরমা। বলল, বিদেশের আদরের চেয়ে স্বদেশের অনাদরও মধুর। আমি যাব।

এগিয়ে এলেন পণিদের রাজা। বললেন, বোন। যেওনা। তোমার বয়স হয়েছে, এ পথের কষ্ট সহ্য হবেনা তোমার। আর দেখ, এদেশের সবাই তোমাকে আপন করে নিয়েছে। তোমাকে না দেখলে আমাদের ভাল লাগেনা, আমাদের শিশুরা কেঁদে আকুল হবে। বরং তোমার ছেলে মেয়েদেরও আসতে বল এখানে। আমরা আমাদের সমস্ত গোধনের অর্দ্ধেক দিয়ে দেব তোমাদের।

লোভ! দুরন্ত লোভ পেয়ে বসল সরমাকে। নিজের পায়ের দিকে তাকাল সরমা। বয়সের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এত কষ্ট কি আর সহ্য হবে! তার থেকে এখানে আনন্দে সমাদরে । সরমার মনটা লোভে দুলতে থাকল।

রাজা আবার ডাকলেন, বোন! সরমা!

না! সব ঝেড়ে ফেলল সরমা! লোভ-মোহ-ভবিষ্যত সবকিছুর চেয়ে বড় স্বদেশ। মনে মনে প্রণাম করল সরমা। বলল, মা, মাগো! আমার স্বদেশ! আমার জন্মভূমি! তারপর সহসা তীরের মত ছুটে বেরিয়ে গেল। অনেক পাহাড়, অনেক নদী, অনেক সমুদ্র পার হয়ে তবে তাকে যেতে হবে স্বর্গে—তার স্বদেশে। তার কি দাঁড়াবার অবকাশ আছে।

অপশিক্ষার বিরুদ্ধে

(ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে)

আপন মনে বনে বনে ঘুরে বেড়াত ছেলেটা। কোথায় হরিণ ছানা, কোথায় কাঠবেড়ালী এমন কি মৌমাছিরা কেমন করে চাক বাঁধে তার দিকেও ছেলেটার নজর। কিন্তু লেখা পড়া শিখবার বিন্দু আগ্রহ নেই তার। বই নিয়ে বসলে শির দাঁড়া ব্যথা করে; দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। মহাপণ্ডিতের একি মুর্খ ছেলে হল।

নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল তাঁর। তাঁর প্রকৃত নাম আরুণি। গুরু আয়ুধধৌম তাকে চাষের জমির আল রক্ষা করতে বলেছিলেন। মাটি কেটে কেটে আলরক্ষা না করতে পেরে তিনি বাঁধের ওপর শুয়ে ছিলেন। গুরু এসে যে অবস্থায় দেখে খুব খুশি এ কাদা থেকে উঠে এলেন দেখে তাঁর নতুন নাম হল উদ্দালক। এই নামেই তিনি বিখ্যাত। সারা ভারতের কোন কোন প্রাণ্ড থেকে ছাত্র এসে তাঁর কাছে শিখে পণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে আর তার ছেলেটাই হয়ে রইল মুর্খ।

উদ্দালক তাঁর দুশ্চিন্তার কথা সমবয়সী ঋষিদের বললেন।

তারা বল্‌লেন, বড় হোক, দেখবে ঠিক শিখবে।

উদ্দালক বললেন, আর কত বড় হবে? শ্বেতকেতুর বয়স যে এর মধ্যেই বারো হয়ে গেছে। আর কবে শিখবে বেদ পুরাণ উপনিষদের কথা। কবে জানবে যাগ-যজ্ঞ ব্রত অনুষ্ঠানের রীতিনীতি?

বৃদ্ধ পুষ্কর ঋষি বললেন, নিজ পুত্রকে নিজে শিক্ষা দিতে যেওনা উদ্দালক। সকলেইত' ব্যাসপুত্র শুকদেব হয় না। ওকে অন্য কোন যোগ্য গুরুর কাছে পাঠাও। দেখবে শ্বেতকেতুও পণ্ডিত হয়ে আসবে।

কথাটা মনে ধরল উদ্দালকের। তিনি গুরু নির্বাচন করে শ্বেতকেতুকে জানালেন, তোমাকে গুরুগৃহে যেতে হবে।

বিস্ময়ে বাবার দিকে তাকাল শ্বেতকেতু। জিজ্ঞাসা করল, কেন?

উদ্দালক বললেন, ঋষির ছেলে তুমি। তোমাকে বেদ-উপনিষদ শেখতে হবে না! যাগ-যজ্ঞের রীতিনীতি শিখতে হবে না!

শ্বেতকেতু বল্‌ল, শিখতেই যদি হয়ত তোমার কাছে শিখব। আমি এ আশ্রম ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না। এখানকার পশুপাখি—

উদ্দালক ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। ওই পশুপাখিই তোমাকে খেয়েছে। এখানে থাকলে ওগুলোই তোমার মাথা আর মন জুড়ে থাকবে। আসল শিক্ষা কিছুই হবে না। তোমাকে অন্য গুরুর কাছে যেতেই হবে।

শ্বেতকেতু কেঁদে ফেল্‌ল, না, বাবা না! দেখো এবার থেকে আমি সব শিখব।

বাবা বললেন না, গুরুগৃহে তোমাকে যেতেই হবে।

পরদিন উদ্দালক নিজে সঙ্গে করে তাকে নিয়ে গিয়ে গুরুগৃহে রেখে এলেন। গভীর দুঃখে আর বাবার প্রতি অভিমানে পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল শ্বেতকেতু। বাবা যখন চলে যাচ্ছেন, তখন একটা প্রণামও করলে না।

দুর্জয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে পড়াশুনা শুরু করল শ্বেতকেতু। যা অন্য ছাত্র দশবারে বোঝে না তা শ্বেতকেতুর একবারে মুখস্থ করে। সে যেন শ্রুতিধর। শোনা মাত্র কণ্ঠস্থ করে ফেলে। যা অন্যেদের শিখতে দশ বছর লাগে তা শ্বেতকেতু শিখে ফেল্‌ল মাত্র চার বছরে। গুরু বললেন, শ্বেতকেতু। তুমি অসাধ্যসাধন করেছে। তুমি এসেছিলে সবচেয়ে বেশি বয়সে সবচেয়ে কম শিখে, তুমি যাচ্ছ সবচেয়ে কম বয়সে সবচেয়ে বেশি শিখে।

শ্বেতকেতু প্রণাম করল গুরুকে। তার বুকে এক অদ্ভুত আনন্দ জেগে উঠল। কতদিন বাবা তাকে আশ্রমের পশু-পাখি সকলের থেকে আলাদা করে রাখলেন! এবার দেখবে সে বনে বনে খেলে বেড়ালে বাবা তার কি বলতে পারেন। ভারতবর্ষের সমস্ত শাস্ত্র তার কণ্ঠস্থ।

গুরুর কাছে বিদায় নিয়ে দ্রুত হেঁটে চল্‌ল শ্বেতকেতু। কত তাড়াতাড়ি বাবার সামনে উপস্থিত হওয়া যায়। পথে কোথাও বিশ্রাম করল না সে। তিনদিন তিনরাত ক্রমাগত হেটে হাজির হল বাবার সামনে। প্রণাম করে বল্‌ল, আমি গুরুর সব বিদ্যা শেষ করে এসেছি।

উদ্দালক খুশি মুখে তাকালের পুত্রের মুখের দিকে। কিন্তু একি। পুত্রের মুখে বিনয় কোথায়? এ যে শুধুই গর্ব। তার সামনে দাঁড়িয়ে এক উদ্ধত যুবক। যে বিদ্যা বিনয় না দেয় তা যে বিদ্যাই নয়,—যে শিক্ষা নয় অপশিক্ষা। চার বছর ধরে এ কি শিখে এল তার পুত্র!

মনে মনে ব্যথা পেলেন উদ্দালক। বুঝলেন এ জন্য তার পুত্রও যতখানি দায়ী, তার গুরুও তার থেকে কম দায়ী নন। তিনি মুখস্থই করিয়েছেন, মর্মোদ্ধার করাতে চান নি। আর শ্বেতকেতুও মুখস্থই করে এসেছে। যা না বুঝে মুখস্থ করা যায় তা তো শিক্ষা হয় না।

শ্বেতকেতু শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার পরিকল্পনা করে উদ্দালক বললেন, শ্বেতকেতু তুমি বেদ পড়েছ?

শ্বেতকেতু বল্‌ল, পড়েছি। চতুর্বেদ আমার কণ্ঠস্থ।

হুঃ। বাবা বল্‌লেন, আচ্ছা শ্বেতকেতু বলত, মনের স্বরূপ কি?

মনের স্বরূপ! শ্বেতকেতু মনে মনে সমগ্র বেদ আউড়ে গেল। না! কোথাও ত এর উত্তর আছে বলে মনে হ'ল না। যে পাল্টা প্রশ্ন করল, উত্তরটা আপনিই বলুন পিতা।

উদ্দালক বললেন, মন অন্নময়।

হো হো করে হেসে উঠল শ্বেতকেতু! বল্‌ল, মন অন্নময়! এ কি বলছেন পিতা! অন্নের সঙ্গে মনের সম্পর্ক কোথায়? অন্ন দেহের শক্তি যোগায়। কিন্তু মনের শক্তি? সে তো যোগায় বিদ্যা। মনকে তবু বিদ্যাময় বলা যেতে পারে।

উদ্দালক বললেন, তুমিত' আমায় চিন্তায় ফেললে শ্বেতকেতু! এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একদিন 'গভীর আলোচনা করব। তবে তার আগে তোমার মনকে শুদ্ধ করবার জন্য সাতদিন উপবাস কর। প্রথম তিনদিন জল খাবে। শেষ চারদিন নির্জলা।

রাজি হয়ে গেল শ্বেতকেতু। মনে মনে ফুটছে সে। সে বাবাকে দেখিয়ে দেবে যে সে সহজ ছেলে নয়। সাতদিনই উপবাস করবে সে।

কিন্তু সাতদিন উপবাসত' সহজ ব্যাপার নয়। প্রথম দিন উপবাস করে তার দেহ সামান্য দুর্বল হ'ল বটে কিন্তু তাকে সে আমলই দিল না। দ্বিতীয় দিনে দুর্বলতা আর একটু বাড়ল মাত্র। তৃতীয় দিনে তার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকল। চতুর্থ দিন

থেকে জলটুকুও খাওয়া নিষেধ। একেবারে শয্যায় লুটিয়ে পড়ল সে। এমনি করেই কোন ক্রমে পঞ্চম-ষষ্ঠ দিন কেটে গেল। সপ্তম দিনে তার গলা দিয়ে স্বর বের হচ্ছে না, কানগুলো ঝাঁ ঝাঁ করছে—হাত পা এলিয়ে পড়েছে। চোখে দেখছে অন্ধকার। উদ্দালক এলেন শয্যার পাশে! বললেন, কেমন আছ শ্বেতকেতু!

শ্বেতকেতু ঘাড় নাড়ল। বল্‌ল, উপবাস শেষ করেছি পিতা।

নিষ্ঠার সঙ্গে করেছ ত'!

শ্বেতকেতু ঘাড় নত করল।

উদ্দালক বল্‌লেন, এবার বলত বেদের প্রথম পংক্তি।

চিন্তা করতেই মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরে উঠল। বেদের কোন পংক্তিই তার মনে পড়ল না। শ্বেতকেতু বল্‌ল, বাবা! আগে খাবার দিন!

সঙ্গে সঙ্গে উদ্দালক খাবার আনালেন। হাল্কা সহজ পাচ্য খাবার। সে দিন খাবার খেয়ে বিশ্রাম করতে বললেন তিনি। বললেন আগামী দু দিন পেট পুরে খাবে। তারপর আমরা আলোচনায় বসব।

দুদিন পরে শ্বেতকেতু যখন এলো তখন তাকে অনেক উজ্জ্বল লাগছে। উদ্দালক বললেন, এবার বেদের প্রথম শ্লোক বলতে পার শ্বেতকেতু।

শ্বেতকেতু মাথা নত করে বল্‌ল, আর লজ্জা দেবেন না পিতা। এবার আমি বুঝেছি মনের শক্তিরও উৎস অন্ন। দেহ যদি পুষ্ট না থাকে তবে মনেরও শক্তি থাকে না। অতএব মনও অন্নময়।

উদ্দালক বল্‌লেন, ঠিক।

শ্বেতকেতু বল্‌ল, বাবা! আমি আরও বুঝেছি যে আমি এতদিন মুখস্থই করে এসেছি। গরু যেমন বোঝা বয়, আমার মনেরও তেমনি বিদ্যের বোঝা। ওর একটুও আমি বুঝি নি। এবার আপনি আমায় সত্যিকার শিক্ষা দিন বাবা। বলে বাবার পায়ে মাথা নত করল শ্বেতকেতু।

উদ্দালক তাকে দু হাতে তুললেন। বললেন, ওঠ শ্বেতকেতু! আর তোমাকে শিক্ষা দেবার দরকার নেই। তুমি যে মুহূর্তে বুঝেছ যে তুমি শেখনি, সেই মুহূর্ত থেকেই তোমার প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয়েছে। এখন থেকে দেখবে সব তুমি নিজেই তিলে তিলে বুঝতে পারছ। তোমার অপশিক্ষার ভুত দূর হয়েছে। তুমি বিনয়ী হয়েছ।
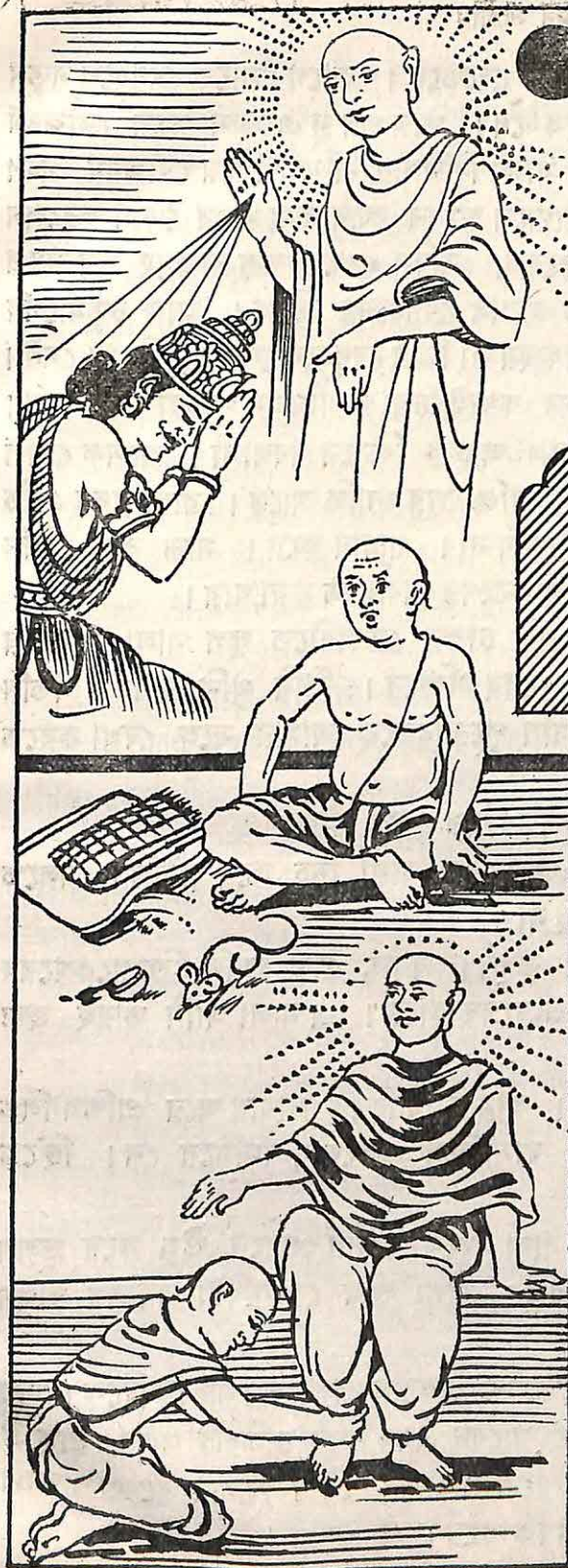
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে
(বৌদ্ধজাতক থেকে)

রাজগীরেরই অন্য নাম রাজগৃহ। তখন সবে নতুন রাজধানীটি নির্মিত হয়েছে। বাঁধান বিস্তৃত পথ। কোথাও সুন্দর সাজান দোকান। কোথাও সবুজ পাতার বীথি। কখনও চলেছে সুসজ্জিত দলবদ্ধ সৈনিকেরা কখনও অভিজাত ধনিকদের অশ্বরথ বা হাতি কখনও সুবেশধারী নরনারী। অদূরে উষ্ণ প্রস্রবণ। সেখানে স্নানার্থীর ভীড় লেগেই আছে। তার থেকেও বেশি ভীড় বেণু বনে। সেখানে বেশ কিছুদিন থেকে স্বয়ং বুদ্ধদেব বাস করছেন।

স্বয়ং বুদ্ধদেবের মুখে বাণী শুনতে লোকের ভীড় আগেও হত। তিনি যখন জাতিভেদের বিরুদ্ধে বা যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়া কর্মের বিরুদ্ধে বলতেন, তখন সকলে শুধু মুগ্ধ হত না—ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধও হত। ফলে তারা আরও বেশি করে ছুট্‌ত তাঁর কাছে। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারত কম নয়। ধর্মের সূক্ষ্ম কথা কে জানে! ব্রাহ্মণেরা যা ব্যাখ্যা করে, তাই মানতে হয়। পান থেকে চুণ খসলেই জরিমানা, প্রায়শ্চিত্ত স্বস্ত্যয়ন। পদে পদে বাধা নিষেধ—নিয়ম-নীতি। তার চেয়ে বুদ্ধদেবের ধর্ম অনেক সহজ সরল। সকলেই বুদ্ধদেবের প্রতি আকৃষ্ট। তাই ভীড়।

কিন্তু কিছুদিন থেকে এ ভীড় আরও বেড়েছে। আগে লোকে বেণুবনে নতুন সন্ন্যাসীকে দেখতে যেত হুজুকে, পরে আকর্ষণে। তার পর দু একজন করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করা শুরু করল। কিন্তু যেদিন রাজা বিম্বিসার নিজে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন, যখন তাঁর পাদনখ কণা এনে বাগানে স্থাপন করে তার ওপর তৈরী করলেন চৈত্য, সেখানে ধুপ দীপ অর্চ্চনা শুরু করলেন, সেদিন থেকে শুধু রাজগৃহ নয় সমগ্র মগধের জনগণ যেন পাগল হয়ে ছুটতে লাগল বেণুবনের দিকে। আজ চতুর্মার্গের সংযোগ স্থলে ত্রিকালেশ্বরের মন্দিরে লোক হয় না কিন্তু বেণুবনে লোকের বিরাম নেই।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে এসব কথাই চিন্তা করছিলেন পুণ্ডরীকাক্ষ শর্ম্মা। তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিষ্ঠাবান। সমস্ত রকম আচার বিচারে বিশ্বাসী। অনেক টোল চতুষ্পাটি আছে তার। দেশ বিদেশে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে। ব্রাহ্মণদের প্রতি অবজ্ঞার ধুম পড়লেও কেউ তাঁকে অবজ্ঞা করে না। সম্মান করে। মান্য করে তিনি ভাবছিলেন কি করে বুদ্ধদেবের প্রতি এ আকর্ষণের প্রবাহবন্ধ করা যায়।

এমন সময় তিনি দেখলেন তার এক চাকর রেকাবীতে ফুল মালা সাজিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছে। নিশ্চয় ত্রিলোকেশ্বরের মন্দিরে। তিনি খুশি হলেন। তিনি বলেন, মন্দিরে যচ্ছিস ত' একবার প্রধান পুরোহিতকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস ত'।

মাথা নত করল চাকরটি। কি বলতে গিয়ে থেমে রইল।

ছুটে এল একজন দাসী। বল্ল, এখন কেন মাথা নিচু করে রইলি! বলতে পারছিস না সত্যিকথা? সাহসে কুলচ্ছে না!

চাকরটি দাসীর তিরস্কারে মাথা তুল্ল। বল্ল, প্রভু আমি ত্রিলোকেশ্বরের মন্দিরে যাচ্ছি না। যাচ্ছি বেণুবনে। বুদ্ধদেবের কাছে। এ মালা আমি তারই জন্য গেঁথেছি।

কি! গর্জে উঠলেন পুণ্ডরীকাক্ষ। আমার বাড়িতে আমার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে সেই বিধর্ম্মীর জন্য মালা গাঁথা। দাসীটিকে বললেন, ছিনিয়ে নে। ছিঁড়ে ফেল। পায়ে দলিয়ে নষ্ট করে দে।

দাসীটি ছুটে গেল। চাকরটি বাধা দিয়ে মাথার ওপরে উঁচু করে তুলল মালাটা। বল্ল, ওকে থামতে বলুন প্রভু! মালা শুদ্ধ রেকাবিটা নামিয়ে রাখল পুণ্ডরীকাক্ষের পায়ের কাছে।

তিনি একবার চাকরটির দিকে চাইলেন, একবার তাকালেন মালার দিকে। তার পর মালাটি তুলবার জন্য হাত বাড়াতে যাবেন এমন সময় চাকরটি বল্ল, প্রভু ঐ ফুলের মালাটা ছিঁড়তে পারেন, নষ্টও করতে পারেন। কিন্তু আমার বুকের ভেতর যে ভক্তিমালা তৈরী হয়েছে, তা ছিঁড়বেন কি করে।

থমকে গেলেন পুণ্ডরীকাক্ষ। বললেন, এ মালা রেকাবী সব নিয়ে তুমি চলে যাও। যার বুকের মধ্যে সেই নাস্তিক পাষণ্ডী বাস করছে, তাকে আমি চোখের সামনে দেখতে চাই না। তুমি আর এ বাড়িতে ফিরবে না।

চাকরটি বল্‌ল, তাই হবে প্রভু। আমি যে আশ্রয় পেয়েছি, তার পর আপনার আশ্রয় আমার বোঝা হয়ে উঠেছিল। তথাগতের কৃপায় আমি বন্ধন-মুক্ত হলাম। তথাগত আপনার মঙ্গল করুন। বলে চাকরটা চলে গেল।

সেদিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা জ্বলে গেল পুণ্ডরীকাক্ষের। তার বাড়ির মধ্যেও নাক গলিয়েছে সেই যাদুকর। কে জানে তার স্ত্রী বেঁচে থাকলে তিনিও আগ বাড়িয়ে গিয়ে সেই নাস্তিকের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করত কিনা! তবে সৌভাগ্য তার, তার পুত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অটুট বিশ্বাসী। সেখানে হাত বাড়ান ঐ মহাযাদুকরের পক্ষেও সম্ভব নয়। পুত্রের কথা ভেবে মাথাটা খানিক শান্ত হলেও তিনি স্থির হতে পারলেন না। ঐ নাস্তিকটাকে কি করে দূর করা যায়, সে কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গেলেন।

এমন সময় দাসীটি এসে তার সামনে তেলের বাটি রাখল। বল্‌ল, আপনার স্নানের সময় হয়েছে। বলে পাশে রাখল গামছা আর পাট করা ধোঁয়া কাপড়। তিনি চিন্তা ছেড়ে উঠলেন। তেলের বাটি টেনে নিলেন।

তেল মাখা শুরু করবার আগেই এক কাণ্ড ঘটল। কাপড়ের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে বের হল একটা ইঁদুর। তার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল খানিকটা কুচি কুচি করে কাটা কাপড়ের অংশ। ইঁদুরটা কোথায় দৌড়ে পালাল। সর্বনাশ! পুণ্ডরীকাক্ষ চিৎকার করে উঠলেন, ধনঞ্জয়! ধনঞ্জয়!

চিৎকার শুনে তার পুত্র ছুটে এল। কি হয়েছে বাবা!

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লেন, ধনঞ্জয়। সর্বনাশ হয়েছে। এ কাপড়টা ইঁদুরে কেঁটেছে।

ধনঞ্জয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝল না। বল্‌ল, তাতে কি হয়েছে বাবা?

জান না! ইঁদুরে কাটা কাপড় ভীষণ অপবিত্র। তা স্পর্শ করা পাপ। সে বস্ত্র পরলে অনিবার্য মৃত্যু।

ধনঞ্জয় বল্‌ল, কি সাংঘাতিক! বাবা, আপনি তা হলে দেখুন শাস্ত্রে এর কি প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে। এর জন্য কি স্বস্ত্যয়নই বা করা উচিত। আমি কোন চাকরকে বলছি, সে গিয়ে কাপড়গুলো শ্মশানে ফেলে আসুক।

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লেন, না কোন চাকরকে পাঠিও না। সে লোভের বশে নিজেই এই মূল্যবান বস্ত্র আত্মসাৎ করতে পারে। তাতে তার ক্ষতি বা মৃত্যু হলে, তার পাপের অংশ আমাতে বর্তাবে। তুমি নিজেই যাও।

ধনঞ্জয় দুটি কাঠির মাথায় করে লোকে যেমন করে মরা সাপ নিয়ে যায়, তেমনি করে কাপড়গুলো কাঠির মাথায় বাধিয়ে নিয়ে গেল। সে যখন অমনি করে কাপড় নিয়ে শ্মশানে উপস্থিত হ'ল তখন সেখানে বুদ্ধদেব শিষ্যদের নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ছেলেটিকে অমনি করে কাপড় আনতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

ধনঞ্জয় তার বাবার কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করল। শুনে বুদ্ধদেব হাসলেন। তারপর উঠে গিয়ে কাপড়টি তুলে নিয়ে জড়িয়ে ফেললেন নিজের কোমরে। তা দেখে ধনঞ্জয় চিৎকার করে উঠল, একি করলেন। আপনি বিধর্মী হন, আর যাই হন, মৃত্যুকে ভয় করেন না?

হো হো করে হাসলেন বুদ্ধদেব। বললেন, যুবক ঐসব আচার মানলেই কি তুমি অনন্তকাল বাঁচবে? আমি দেখতে চাই ঐ ইঁদুরে কাটা কাপড়ের কত শক্তি!

ধনঞ্জয়কে যেন পাগলা কুকুরে তাড়া করেছে এমনি করে ছুটল বাড়ির উদ্দেশ্যে। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বাবাকে বল্‌ল, বাবা? সর্বনাশ হয়েছে। সব কিছুতে অবিস্বাসী বুদ্ধদেব নিজে সেই কাপড় কুড়িয়ে নিয়ে পরেছেন। কিছুতেই তা খুললেন না।

চমকে উঠলেন পুণ্ডরীকাক্ষ। বলে কি তার ছেলে! কি দুর্জয় সাহস সেই বিধর্মীটার। নির্দ্বিধায় ঐ কাপড় কুড়িয়ে নিয়ে পরল! অন্য চিন্তা এল তাঁর মনে। ভালই হয়েছে। বড্ড বাড় বেড়েছিল। এ সবই ত্রিলোকেশ্বরের লীলা। তিনিই লোভ জাগিয়েছেন ওর মনে। অতগুলি কাপড়ের লোভ ছাড়তে পারে নি। মুর্খ জানে না, ও আর কাপড় নয়—ওগুলি স্বয়ং যমরাজের দূত। এইবার বিধর্মীটার ধ্বংস অনিবার্য। আনন্দিত হয়ে উঠল তাঁর মন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা চিন্তা জাগল তার মনে। বিধর্মী হলেও ত' সে মানুষ। তার মৃত্যুতেও ত' কিছু পাপ বর্তাবে তার, তাকে নিবৃত্ত করা দরকার।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির গাড়িটা আনালেন। তাতে বোঝাই করলেন বাড়ির যত ভাল ভাল কাপড়-চোপড়। তারপর প্রচুর অর্থ সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন বেণুবনে।

তাকে আসতে দেখে বুদ্ধদেব এগিয়ে এলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌ল, এই দেখ গৌতম, তোমার জন্য আমি কত ভাল ভাল কাপড় এনেছি। এগুলি তুমি নাও, তোমার শিষ্যদের দাও। যদি প্রয়োজন হয়, তবে আরও অর্থ দিচ্ছি, আরও বস্ত্র আন। শুধু ইঁদুরে কাটা ঐ কাপড় দুটি ফেলে দাও।

বুদ্ধদেব বললেন, কি হবে তোমার ঐসব বস্ত্র! আমরা যে সন্ন্যাসী। আমরা ত' শ্মশানে ফেলে দেওয়া কাপড়ই পরি। আমরা ত' অন্য কাপড় পরি না।

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লেন, তুমি জান না ইঁদুরে কাটা কাপড় পরা কি সাংঘাতিক।

হাসলেন বুদ্ধদেব। বল্‌লেন, ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি নানারকম কুসংস্কারে অন্ধ হয়ে তৈরী করা ভয়ের রাজ্যে বাস করছ। কুসংস্কারগুলো দিনরাত সাপের মত তোমাকে ঘিরে রেখেছে। পৃথিবীর সমস্ত কাজের পিছনে তুমি আর কিছু দেখতে পাওনা—শুধু দেখ যত জীবজন্ত পশুপাখির ডাক। ওগুলোও তো তোমারই মত জীব—তবে তাদের ডাকায়, তাদের চিৎকারে বা তাদের কাঁদায় অমঙ্গল হবে কেন? নির্বোধের মত প্রত্যেক জীবজন্তুর চলা ফেরায় তুমি অকারণ অমঙ্গল, খুঁজছ। কাক ডাকলে তুমি ভাব অমঙ্গল, টিকটিকি ডাকলে বাধা, পেঁচা ডাকলে সর্বনাশ—যেন স্বয়ং যমরাজ এসে হাজির হয়েছে। এ পৃথিবী তোমার কাছে সৌন্দর্য্যের না আতঙ্কের। রাত্রেও তুমি আকাশের দিকে চাইতে পার না পাছে উল্কাপাত হয়। অথচ এগুলো সবই কি স্বাভাবিক ব্যাপার নয়!

থামলেন বুদ্ধদেব। পুণ্ডরীকাক্ষ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। বুদ্ধদেবের কথাগুলো তার বুকে আলোড়ন তুলেছে। বুদ্ধদেব বুঝলেন তার অবস্থা। বললেন, ভাব তুমি কি জীবন যাপন করছ। যত সংস্কার দিনভর তোমোকে আতঙ্কিত করে রাখছে, রাতে সেই আতঙ্কের স্বপ্ন দেখছ তুমি। যে এর একচুল এদিক ওদিক করেছে অমনি তুমি চেঁচিয়ে উঠছ পাপ-পাপ-পাপ। পাপের আতঙ্ক তোমায় পেয়ে বসেছে। এর থেকে কি তুমি মুক্তি পাও না?

পুণ্ডরীকাক্ষ বুদ্ধদেবের পা জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, প্রভু! আমায় আপনি মুক্তির পথ দেখান।
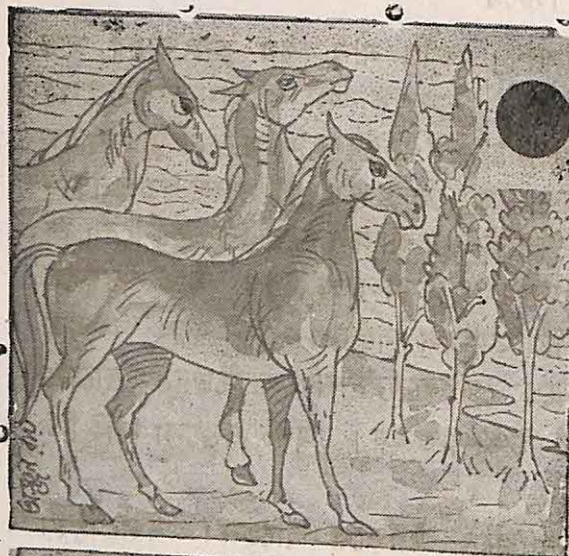
হঠকারিতার বিরুদ্ধে

(জৈন রাজকথোবলী থেকে)

ছোট দ্বীপ। চারদিকে সমুদ্রের জল দিনরাত ছোট মেয়ের মত নেচেই চলেছে। তীরে তীরে চিক্‌চিকে বালি। তারপরেই গভীর বন। বড় বড় গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো চোরের মত চুরি করে প্রবেশ করে সেখানে।

সেই দ্বীপটির মাঝখানে মস্ত বড় এক সরোবর। কি মিঠে তার জল আর তার চতুর্দ্দিকে কি সবুজ আর কি তাজা ঘাস। কোথাও ধান, কোথাও গম, কোথাও ছোলা। চাষ করতে হয় না। আপনা থেকে হয়, ঝরে, আবার হয়।

সেই বনে বাস করত হরেক রকম পাখি আর বাস করত একদল ঘোড়া।

ঘোড়ারা সবুজ ঘাস খেত পেট ভরে। সরোবরে মিঠে জলে তাদের তৃষ্ণা দূর হত। তীরের বালুর ওপর ছুটত তারা এদিক থেকে ওদিক। বনের মধ্যে খেলত তারা লুকোচুরি। কখনও বা পাখির গানের তালে নাচত।

ওদের সর্দ্দার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন তাদের। মন তার আনন্দে দুলে

উঠ্‌ত। ঈশ্বর তাদের জন্য কি সুন্দর বাসস্থানই না সৃষ্টি করেছেন। কত কাল ধরে নিশ্চিন্তে এবং আনন্দে বাস করছে তারা। কত পুরুষ ধরে এদেশের রীতি-নীতি দেখে শুনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জীবন যাত্রার ছক তৈরী করেছেন পূর্ব-পুরুষেরা। দলের থেকে একজনকে নির্বাচন করে সব শিখিয়ে যান বৃদ্ধেরা। সেই নিয়মে নতুন সর্দ্দার দল চালায়। সে বুড়ো হলে শিখিয়ে দেয় আর একজনকে।

সর্দ্দার ভাবল সেও বুড়ো হয়েছে। এবার সব কিছু শেখাতে হবে একজনকে। একটি তরুণ ঘোড়াকে সে মনে মনে নির্বাচনও করেছে। তেজ আছে তার, মনে সাহসও আছে। কিন্তু একটু বেয়ারা। অনেক সময় তার নির্দ্দেশই মনেতে চায় না। মনে মনে হাসল সর্দ্দার। তরুণ বয়সের ধর্মই এই। বুড়োদের মানতে চায় না। কিন্তু সত্যিকারের বুড়োদের কথাত' অভিজ্ঞতার কথা। তাকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। কিন্তু সত্যি বুড়ো পাওয়াই ত' মুস্কিল। বেশির ভাগের বয়সই বাড়ে। বুদ্ধিত' বাড়ে না। তাদের জন্যই তরুণেরা সকল বুড়োকে অস্বীকার করে। দায়টা বুড়োদেরই।

এমন সময় একদিন উঠল প্রচণ্ড ঝড়। ঝড়ের দাপটে সমুদ্র উঠল ফুলে। আট দশ হাত উঁচু হয়ে ঢেউ উঠতে থাকল। উপকূল ডুবে গেল। ডুবে গেল ওদের দৌড়ো-দৌড়ি করবার মাঠ, লুকোচুরি খেলবার বন। বনও চুপ করে রইল না। ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাছগুলোও যেন মাথা ঝাঁকিয়ে হাত নেড়ে নাচতে চাইল। কেউ বা উল্টে পড়ল ঘাড় মুখ গুঁজে। সর্দ্দার চেঁচিয়ে উঠল, বিন্দুমাত্র দেরী করো না। ছুটে চল পাহাড়ের ওপর—আমাদের সেই নির্দ্দিষ্ট গুহায়।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ঘোড়ার দল। সকলে গাদাগাদি করে দাঁড়াল সেখানে। বাইরের ঝড় জলের ঝাপটার বিন্দুবিসর্গও জানা যাচ্ছে না সেখানে। বাইরের হিম-হিম বাতাসের প্রকোপও সেখানে নেই। এবং অতগুলো প্রাণীর নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে গরম হয়ে উঠল গুহাটা। একটি ঘোড়া আরামে পরিতৃপ্ত হয়ে পাশের ঘোড়ার কানে কানে বল্‌ল, দেখেছ সর্দ্দারের বুদ্ধি! বাইরে কত ঝড় জল শীত। আর আমরা আছি কি আরামে!

যাকে বল্‌ল, সে বল্‌ল, হবে না কেন! এ যে আমাদের বাপ-পিতামহদের নির্দ্দেশ। আমাদের শাস্ত্রের বচন।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সেই নবীন ঘোড়াটি। সে এ কথা শুনে ঝামটা দিয়ে উঠ্‌ল। বল্‌ল, রাখ তোর শাস্ত্রের বচন। এতটুকু জায়গায় এতগুলি ঘোড়া থাকতে পারে। গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বাইরে আকাশ নাচছে, সমুদ্র নাচছে, নাচছে সারা অরণ্য, আর আমরা এখানে গরমে ভেপসে মরছি। শুনতে পাচ্ছিস না বৃষ্টির গান, আর ঝড়ের বাজনা! তোর মন নাচছে না!

পাশের ঘোড়াটি বল্‌ল, নাচছে ত' মন কিন্তু করব কি? বাইরে গেলে যদি বাজ পড়ে, ভাঙ্গা গাছের তলায় চাপা পড়ি! কিংবা যদি সর্দ্দি লাগে!

ফুঃ করে সব উড়িয়ে দিল তরুণ ঘোড়াটি। তিন লাফে নেমে এল মাঠে। পাহাড় অরণ্যে জলের মধ্য দিয়ে সে ছুটল আনন্দে।

সর্দ্দার গর্জ্জে উঠলেন। বললেন, ওরে ফিরে আয়। মরবি যে।

তরুণ বল্‌ল, মরিত' ঝড়ের দোলায় দুলতে দুলতে মরব, মরিত' সাগরের ঢেউ-এ ভাসতে ভাসতে মরব। ঐ বদ্ধ গুহায় ইঁদুরের মত মরব না!

ওর উত্তর শুনে সর্দ্দার স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সমস্ত দলটা আঁতকে উঠ্‌ল। একদল বল্‌ল, সর্দ্দার, আদেশ দাও ওকে ধরে আনি।

সর্দ্দার বললেন, না। ও যাক! এমনি করে মাঝে মাঝে নতুনের পরীক্ষা করতে হয়। এ জন্য মাঝে মাঝে কারো কারো প্রাণ যায়। কিন্তু তাতে মঙ্গল হয় গোটা দলের। সাহসী ভিন্ন কেউ এমন পরীক্ষায় যেতে পারে না।

দলের সবাই থেমে গেল।

ঝড় থামল প্রায় শেষ রাতে।

ভোর হতে সর্দ্দার দল নিয়ে বাইরে এলেন। সেই তরুণ ছাড়া দলের সকলেই বেঁচে আছে। অক্ষত আছে। অথচ এক রাতের ঝড়ে বনটার কি অবস্থা হয়েছে। বোধ হয় একটা গাছও আস্ত নেই। কে জানে তরুণ ঘোড়াটার কি অবস্থা হয়েছে।

এমন সময় ঝড়ের মত ছুটে এল তরুণটি। এসে আনন্দে হেসে প্রণাম করল সর্দ্দারকে। বল্‌ল সর্দ্দার! আমি মরি নি। কাল রাতে ঝড়ের সঙ্গে মেতে যে আনন্দ পেয়েছি, সারা জীবনে তত আনন্দ আর পাই নি।

সর্দ্দার বললেন, খুশি হলাম। কিন্তু জেনো, এ আনন্দ সকলের জন্য নয়। তোমার মত শক্তিমান দু-এক জনই এ আনন্দ ভোগ করতে পারে।

তরুণটি কোন কথা বল্‌ল না। কিন্তু সর্দ্দার বুঝল তরুণের মনে বিদ্রোহ জমেছে। যে তাকে স্বীকারও করতে চাইছে না, অস্বীকারও করছে না। এ সময়টা বড় খারাপ। ওকে নজরে রাখতে হবে। সর্দ্দার বল্‌ল, চল আমরা এবার চরবার মাঠে যাই।

চরবার মাঠে এসে অবাক হ'ল ওরা। সেখানে একদল দু পেয়ো জীব। সর্দ্দার ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে বল্‌ল, সম্ভবত এরাই মানুষ। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে এদের সম্পর্কে সাবধান হতে।

সর্দ্দার ঠিকই বলেছে। ওরা মানুষ। একদল বণিক। এসেছিল বাণিজ্য করতে।

কালকের ঝড়ের মুখে খান দুই নৌকা দ্বীপের নদীতে ঢুকে পড়ে রক্ষা পেয়েছে, অন্য-গুলো গেছে তলিয়ে। ওরা নিচে নেমে ,তাঁবু খাটিয়ে রান্না বাড়া করছিল। ওরাও এতগুলো ঘোড়া দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

তরুণ ঘোড়াটি দু-পেয়োদের সম্পর্কে কৌতূহল দমন করতে পারল না। সে পায় পায় এগিয়ে গেল সেদিকে। সর্দার চেঁচিয়ে উঠল, নতুন কিছু দেখলেই আগে এগিয়ে যেও না। শাস্ত্রে বলেছে, আগে দেখ, বোঝ তারপর যা করবার কর।

তরুণ ঘোড়াটি একবার সর্দারের দিকে চেয়ে এগিয়ে গেল।

দূর থেকে ঘোড়াটিকে দেখছিলেন সওদাগর। এত সুগঠিত দেহ রাজা মহারাজার অশ্বশালাতেও নেই। যদি ধরা যায় ঘোড়াগুলোকে। লোভে টিপ্ টিপ্ করে উঠল তার চোখ। সে তার চাকরকে বল্‌ল, নৌকো থেকে ছোলার বস্তা বের করে খানিকটা ঘোড়াটাকে খেতে দে।

চাকরটি নৌকো থেকে এক গামলা ছোলা এনে ধুয়ে তাতে সামান্য লবণ মাখিয়ে ঘোড়াটার কাছাকাছি রেখে গেল।

সর্দার চেঁচিয়ে উঠল, অচেনা কেউ অকারণে হঠাৎ কিছু খেতে দিলেই তা খেতে নেই। সেটা মাছ ধরার টোপও হতে পারে।

তরুণ থমকে গেল। কিন্তু নুন মাখান ছোলা থেকে সুবাস উঠে আসছে। টানছে তাকে। অন্যদিকে সর্দারের আদেশ অমান্য করবার একটা জেদ জেগে উঠছে তার মনে। সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে এগিয়ে গেল। খেল সেই গামলা থেকে। আঃ কি সুস্বাদু খাবার। সর্দারের কথা মানলে তার জীবনে এমন পরম লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হ'ত। সে গো গ্রাসে গিল্‌ল সব।

সওদাগর খুশি মনে তাকিয়ে রইলে তার দিকে। এই ঘোড়াই তার দলকে টেনে আনবে তার ফাঁদে। সওদাগর তার চাকরকে আরও নুন-মাখান ছোলা দিতে বল্‌ল।

পরদিন ঘোড়ার দল সেখানে এসে দেখল দু-পেয়োর দল চলে গেছে, কিন্তু পড়ে আছে এক পাত্র বোঝাই খাবার। তরুণটি অন্যদেরও ডাক দিল। অচেনা লোকের দেওয়া খাবার খেয়ে কিছুই হয় নি তরুণের তার ওপরে দু-পেয়োরাও নেই—তাই দলের অন্যদের সাহস বেড়ে গেল। তারাও এগিয়ে গেল পাত্রের কাছে। খেল সেই ছোলা। সকলেই আহ্লাদিত হয়ে উঠল। এত সুস্বাদু জিনিস তারা আগে খায় নি! আহা দুপেয়োরা থাকতে থাকতে যদি সকলে আসা যেত তবে আরও পাওয়া যেত এত খাবার।

তাদের মনে হল সর্দারকে তারা যত বুদ্ধিমান ভাবে, সে তত বুদ্ধিমান নয়। সর্দারের সব কথাই মেনে নেওয়া যায় না। ওরা সকলেই মনে মনে তরুণের দলে চলে গেল।

এদিকে সওদাগর ফিরে গেল নিজের দেশ হস্তিশীর্ষে। সোজা এল রাজার কাছে। সব বল্‌ল। শুনেটুনে রাজার মনেও লোভ জাগল ঘোড়াগুলোকে পাবার। তিনি মন্ত্রীকে নির্দ্দেশ দিলেন, সওদাগরকে পাঠাও সেই দ্বীপে। যত লোক, যত শিকারী যা কিছু লাগে সব নিয়ে সে যাক। ঐ ঘোড়ার দলকে তার ধরে আনতে হবেই।

আদেশ শুনে সওদাগর খুব খুশি। আয়োজন চলল কদিন ধরে। অনেক শিকারী চল্‌ল তার সঙ্গে, অনেক ফাঁদ, অনেক ছোলা, অনেক নুন এবং তার সঙ্গে আরো অনেক কিছু। সর্বশেষে চুটি মস্ত জাহাজ। ঘোড়াগুলোকে আনতে হবেত'।

সওদাগর দ্বীপে এসে ঠিক আগের জায়গাতে আগের মতই তাঁবু ফেললেন। বাড়তি লোকেরা রইল লুকিয়ে। আগের চাকরটি আগের পাত্রটিতে আগের মত নুন মাখান ভিজে ছোলা সাজিয়ে রাখল।

চুদিন কেটে গেল অপেক্ষায়। তৃতীয় দিনে দেখা গেল দলটাকে। তরুণ ঘোড়াটি আনন্দে চিঃ হি হি! করে ডেকে উঠল। ছুটে এল কাছে। খাবার খেল। তারপর দলের দিকে ফিরে আবার ডাকল সকলকে।

এবার আর কেউ বাধা দিতে পারল না ঘোড়াদের। সর্দারের নিদেশ উপেক্ষা করেই ছুটে গেল সবাই। হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই। সুস্বাদু খাবার খেয়ে আনন্দে নাচতে শুরু করল সবাই। ঠিক সেই সময়েই কোথা থেকে বেজে উঠল কি মধুর বাজনা। ওদের রক্তে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিল। সওদাগর ওদের সামনে এগিয়ে দিলেন মদমেশান খাবার। ওদের মনে হল অমৃত। খেয়ে নাচতে নাচতে ওরা এলিয়ে পড়ল। ওদের আর চলবার শক্তি রইল না, পারবারও নয়। তখন বেরিয়ে এল দক্ষ শিকারীর দল। ওরাই এতক্ষণ বাজনা বাজাচ্ছিল। এবার ওরা প্রত্যেক ঘোড়ার গলায় পড়িয়ে দিল ফাঁস। টেনে নিয়ে চল্‌ল জাহাজে।

সওদাগর বন্দী তরুণ ঘোড়াটির পিঠ চাপড়ে বললে, ভাগ্যে দলের মধ্যে তোর মত কমবুদ্ধি অচল লোভী একটা জানোয়ার ছিল। তাইতো গোটা দলটা ধরতে পারলাম।

পরদিন জাহাজ যখন পাল তুলে চলতে শুরু করল, তখন পাগলের মত পারে পারে ছুট্‌তে থাকল সর্দ্দার। ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। কিন্তু কি সাধ্য তার যে ওদের উদ্ধার করে আনে।

জাহাজের ফুটো দিয়ে সর্দ্দারের দিকে তাকিয়ে চোখ ভিজে এলো তরুণ ঘোড়ার। সে চিৎকার করে বল্‌ল, সর্দ্দার আমার নিবুড়ি তাকে ক্ষমা করো। তোমার অভিজ্ঞতার কথা না শুনে আজ আমরা বন্দী! আর কি কোন দিন ফিরে আসতে পারব নিজের দেশে!

শত্রুর বিরুদ্ধে
(ঐশ্লামিক সীরাতুন নবী থেকে)

সিদ্ধিলাভ করবার পর হজরাত মহম্মদ তের বছর মক্কায় ধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু তাঁর আত্মীয় স্বজন ও কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষ ভিন্ন কেউই তখনকার পৌত্তলিক ধর্ম ও বহুদেবতার পূজা ছেড়ে মহম্মদের 'এক-ঈশ্বর' রূপ আল্লার স্মরণ নিল না। বরং তারা মহম্মদের শিষ্যদের ওপর এমন কি স্বয়ং মহম্মদের ওপরেও নির্যাতন চালাতে থাকল।

মহম্মদকে তারা বহুবার ইট-পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। কখনও দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করেছে। বারবার মক্কার পথে-প্রান্তরে জনারণ্যে বা নির্জনে ঝরেছে তাঁর রক্ত। সংখ্যায় সামান্য হলেও তার শিষ্যেরা জোটবদ্ধ হয়েছেন। এ-অত্যাচারের প্রতি-শোধ চাই। রক্ত ঝরা দেহেই মহম্মদ স্নিগ্ধ হেসে বলেছেন, ধৈর্য্য ধর ভাই সব। ধৈর্য্য ধর। আল্লার ওপর নির্ভর কর। তিনিই বিধান দেবেন।

মক্কার সাধারণ মানুষ এবং সে দেশের ক্ষমতাশালী কোরেশ বংশীয়গণের এই অত্যাচারের মুখে সকলেই যে মক্কায় টিকে

থাকতে পারছিলেন এমন নয়। অনেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন মদিনায়। মদিনায় তাদের মুখে মহম্মদের বাণী শুনে অনেকেই ইসলাম ধর্ম বরণ করে নিচ্ছিলেন। তারা মহম্মদকে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। অবশেষে শিষ্যদের অনুরোধে তিনি মদিনাতে যাওয়াই স্থির করলেন। তাকে হত্যার এক চক্রান্ত ব্যর্থ করে মহম্মদ ৬২২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে পালিয়ে গেলেন মদিনায়। ঐ দিন থেকে ঐস্লামিক হিজরী সন গণনা করা হয়।

মদিনাতেই প্রথম সংবর্দ্ধিত হলেন মহম্মদ। সেখানেই তিনি শিষ্যদের সঙ্গে মিলে নিজে হাতে গড়ে তুললেন প্রথম মসজিদ। তার চতুর্দিকে রইল দীন দুঃখী আতুর জনের আশ্রয়। কিন্তু তবু তার মন পড়ে রইল মক্কার দিকে। আল্লাহ্ যদি তাঁকে করুণা করেছেন, তবে যেখানে তার দেহের অজস্র রক্ত ঝরেছে সেই মক্কা জয় হবে না কেন?

মদিনায় মহম্মদের পাশে সমবেত হয়েছে মাত্র শ তিনেক মানুষ। যুদ্ধে অপটু-অশিক্ষিত। অস্ত্রও অতি সাধারণ। কিন্তু অন্তরে তাদের অপরিসীম তেজ। স্বয়ং মহম্মদ যখন তাদের সঙ্গে তখন কে তাদের দমিত করতে পারে! তাদের লক্ষ্য মক্কা অভিযান।

এমনই এক অভিযানের সংবাদ আগেভাগে ছড়িয়ে পড়ল মক্কায়। কোরেশ বংশীয় বীর ঘোরস্ এবং অন্যেরা সৈন্য সজ্জার আয়োজন করতে থাকলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের আর বিশ্বাস নেই তাদের ওপর। ভোর হবার আগে থেকেই তারা মালপত্র নিয়ে ছুটছেন পাহাড়ের দিকে নিরাপদ আশ্রয় চাই। কেউ কোন দিকে তাকাচ্ছেন না। ছুটছেন—শুধুই ছুটছেন। এক লক্ষ্য ঐ দূরের পাহাড়।

দুপুর হয়েছে। সারা মরুভূমি জুড়ে যেন আগুনের হল্কা বইছে। সেই আগুন উপেক্ষা করেও ছুটছে সকলে। একজন বলে, কি দরকার ছিল বাবা তাকে মেরে ধরে মক্কা থেকে বের করে দেবার। এবার আসছে সে লক্ষ সৈন্য নিয়ে। আমরা সাধারণ মানুষ। সাতেও থাকি না পাঁচেও নয়। অথচ মরতে মরণ আমাদেরই।

এমন সময় একজন চিৎকার করে ওঠে, সাবধান। ঐ দূরে ধুলো উড়ছে। আসছে তারা। এসে পড়ল বলে!

পলাতকদের মধ্যে তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। যে যেমন পারে পালায়। পড়ে থাকে যে অক্ষম। পড়ে থাকে সহায় হীন। বোচ্‌কা বুচকি নিয়ে একবুড়ি হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কিন্তু কে দেখছে তাকে। চাচা, আপন পরাণ বাঁচা। সবাই নিজের প্রাণ নিয়ে পালায়।

কিন্তু হঠাৎ বুড়ি শোনে কে যেন বলে, একি! এই বুড়ি মা এখানে পড়ে কেন? বেঁচে আছে ত'!

কথার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন টেনে তোলে তাকে। একটু জল মুখে দেয়। তারপর বলে, তুমি এখানে পড়ে কেন বুড়ি মা!

বুড়ির ঘোর কাটে। সে ভাল করে তার দিকে তাকিয়ে বলে, হে বাবা হেবল। এ তুমি কি করলে! শেষ পর্যন্ত আমাকে মুসলমানেই ধরল! বলেই ডুকরে কেঁদে ওঠে বুড়ি। হে বাবা মুসলমান। তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে কেটো না। আমাকে বাঁচাও।

মুসলমান বলে, কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। তুমি ওঠো। চল, কোথায় যেতে চাও। আমি এগিয়ে দিচ্ছি।

বুড়ি বলে, চল। আমার এ বোঝাটা নিয়ে খানিক দূর এগিয়ে দাও।

মুসলমানটি তুলে নেয় বোঝা। তার সঙ্গে সঙ্গে পায় পায় চলতে থাকে। বুড়ি বারবার তাকায় তার দিকে। তার নিজের ছেলেটা বেঁচে থাকলেও এত বড়ই হোত। ভাবতে ভাবতে একটুক্রো পাহাড় সামনে পড়ে। সেখানেই থামে বুড়ি। বলে, এখানেই থাক বাবা।

বেশ মা। মুসলমানটি নামিয়ে রাখল বোচকা। তারপর বুড়ির ক্ষতস্থানগুলো থেকে বালি টালি ঝেড়ে দিয়ে বল্ল, এবার আমি যাই মা।

না! প্রায় আর্ত্তনাদ করে উঠল বুড়ি। বল্‌ল, না বাবা! তুমি যেও না। তুমি গেলে মুসলমানেরা আমায় কেটে ফেলবে।

মুসলমানটি হাসল। বল্‌ল, না মা। অকারণ ভয় পাচ্ছ। দেখছ ত' ওরা কোন বার কোরেশ যোদ্ধাদের সঙ্গে ছাড়া যুদ্ধ করেনি—নিরীহ কাউকে মারেও নি। আর, দেখছ' ওরা চলে গেল।

বুড়ি বল্‌ল, ওরা ভাল লোক। তুমিও। কিন্তু সেই নিষ্ঠুর মহম্মদ যখন আসবে, তখন ধরবে আর ঘ্যাচ ঘ্যাচ্ কাটবে।

মুসলমানটি বল্‌ল, না। তাও কাটবে না মা। তুমি যে মহম্মদকে ভয় পাচ্ছ—আমিই সেই মহম্মদ।

বুড়ি বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। বলে, তুমিই সেই মহম্মদ। তবে ত' তুমি নিষ্ঠুর নও। তোমার মত এত দয়া কার। মহম্মদ! আমার বাপ মহম্মদ! বুড়ি আপন মনে বলতে থাকে।

সে দিকে তাকিয়ে মহম্মদ শেষবার বলেন, আমি তবে যাই মা!

বুড়ি শেষ বিদায়ের কথাটা বলতেও ভুলে যায়। মহম্মদ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যান। সৈন্যদল বহুদূর এগিয়ে গেছে। পায়ে হেটে তাকে তাদের নাগাল ধরতে হবে।

মক্কার বিশাল বাহিনী মহম্মদের সামান্য কয়েকজন সালবরাহ্ বংশীর সৈন্যের

কাছে গতকালের যুদ্ধে একেবারে বিদ্ধস্ত হয়ে গেছে। বিশাল বাহিনী এভাবে ছত্রখান হওয়ায় সেনাপতি ঘোরেসের মাথায় আগুন জ্বলছে। কয়েকজন সৈন্য নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে এসে ঘোরেস পাগলের মত মহম্মদকে হত্যা করবার কথা চিন্তা করছিলেন।

এমন সময় হঠাৎ তার লক্ষ্য পড়ল কিছু সালবরাহ্ সৈন্য তার লুকিয়ে থাকা পাহাড়ের দিকেই আসছে। তবে কি তারা তার সন্ধান পেয়েছে? খুব সতর্ক হলেন ঘোরেস। যে কজন সৈন্য ছিল, তাদেরই সাজিয়ে ফেললেন তিনি। তারপর ভাল করে লক্ষ্য করতে থাকলেন সেই দলটিকে।

উদ্ধত তলোয়ার হাতে ছুটলেন ঘোরেস। চোখলাল। মুখে পৈশাচিক হাসি। প্রায় লাফাতে লাফাতে মহম্মদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন ঘোরেস। চিৎকার করে উঠলেন, এবার তোকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?

চকিতে উঠে দাঁড়ালেন মহম্মদ। তার মুখে বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত একটুক্‌রো হাসি খেলে গেল। তিনি বল্‌লেন, রক্ষা করবেন আল্লাহ্।

মহম্মদের এই নির্ভিক আচরণে বিস্মিত হয়ে গেলেন ঘোরেস। তবে এটা কোন ষড়যন্ত্র নয়ত'! এমন সময় প্রতিধ্বনি এসে লাগল তার কানে। চমকে উঠে ভয় পেয়ে গেলেন ঘোরেস। তার হাত থেকে তরবারি খসে পরে গেল।

মহম্মদ চকিতে তরবারিটি নিজের হাতে তুলে নিলেন। ঠিক ঘোরেসের ভঙ্গিতেই তরবারির ডগা তার বুকে ঠেকিয়ে বললেন, এবার তোমাকে কে রক্ষা করবে ঘোরেস।

ঘোরেস সম্মুখে মৃত্যু দেখলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু দেখা যোদ্ধা নিজের প্রাণের ভয়ে কেঁপে উঠলেন। তার হাত-পা কাঁপতে থাকল। তিনি বললেন, আমাকে আপনি রক্ষা করবেন প্রভূ!

হেসে উঠলেন মহম্মদ। তরবারি দূরে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, না। আমি নয় ঘোরেস। যিনি আমাকে রক্ষা করলেন, তিনিই তোমাকে রক্ষা করলেন ঘোরেস। তিনিই পরম করুণাময় আল্লাহ্। আমরা সবাই যে তাঁরই সন্তান ঘোরেস।

ঘোরেসের মনে হ'ল তার চোখের সামনে থেকে একটা কালো পর্দা সরে গেল। তিনি যেন এমন পরম সত্য এবং সান্ত্বনার বাণী শুনেন নি। তাঁর বুক কি এক আবেগে কাঁপতে থাকল!

মহম্মদ তার হাত দুটি চেপে ধরলেন। বললেন, বল ঘোরেস, আল্লা হু আকবর।

ঘোরেস মহম্মদের সঙ্গে সঙ্গে সে কথার প্রতিধ্বনি করে কেঁদে ফেলেন। তার বুকে জমে থাকা সব হিংসা চক্রান্ত ও অশান্তি অশ্রুজল হয়ে নামতে থাকল।

হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে

(বাইবেলের নতুন বিধান থেকে)

যিশুখৃষ্ট জন্মেছিলেন আমাদের মহাদেশ এশিয়ারই মধ্যে বিখ্যাত শহর প্যালেস্টাইনের কাছেই বেথলেহেম নগরে। সেখানে এক অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। কিন্তু তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিদেরা বুঝতে পারেন যে এক মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে। তাঁরা ভেবেছিলেন মহাপুরুষ মানেই রাজপুত্র। তাঁরা রাজার কাছে খোঁজ নিতে গেলেন। রাজা জানলেন রাজপুত্র ত' জন্মায় নি। তবে কে সে জন্মাল যার রাজা হবার সম্ভাবনা! তিনি রেগে অল্প বয়সের সব শিশুকে হত্যার আদেশ দিলেন।

যিশুর বাবা মা তাকে নিয়ে পালালেন। তার বাল্যকাল কাটল বাপ মায়ের সঙ্গে পালিয়ে বেড়িয়ে। শৈশবে তিনি বেশি লেখাপড়ার সুযোগ পান নি। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ। বাইবেলের প্রথম ভাগ—যাকে বলা হয় ওল্ড

টেষ্টামেণ্ট বা পুরোন অনুশাসন—তার থেকে অজস্র বাণী যিশু ছেলেবেলাতেই মুখস্থ করেন। সেগুলি হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের মুলমন্ত্র।

যিশুর এক সম্পর্কিত ভাই যোহনও ছিলেন ধর্মপ্রাণ। তিনি প্যালেস্টাইনের কাছে জর্ডন নদীর তীরে বসে ঈশ্বরের নাম প্রচার করতেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে যিশু তাঁর কাছে এসে দীক্ষা গ্রহণ করেন। যোহনের ধর্ম ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে তার মনে হতে থাকে তিনিই নিজে ঈশ্বরপুত্র। ঈশ্বর তাকে এই পৃথিবীতে এক স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলতে পাঠিয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের সুসমাচার জগতে প্রচার করতে প্রত্যাদেশ পেলেন।

এরপর ঘরবাড়ি, বাপ মা সব ছেড়ে যিশু প্যালেস্টাইনের গ্রামে গ্রামে প্রান্তরে প্রান্তরে তাঁর ধর্মমত প্রচার করে বেড়াতে থাকলেন। তিনি বলতে থাকলেন আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, এক ঈশ্বরই আমাদের পিতা। তাই এ জগতে ছোট বড় বলে কেউ নেই। আর ঈশ্বরকে ভালবাসবার জন্য আচার অনুষ্ঠান আর ব্রত পার্বনের কি প্রয়োজন! দেহ পবিত্র আর মন নির্মল থাকলেই ঈশ্বরের প্রীতিলাভ করা যায়।

যিশু সর্বদাই নানা গল্পচ্ছলে তাঁর উপদেশ প্রচার করতেন। আমরা এখানে এমন দুটি গল্প উদ্ধার করব, যার ভেতর দিয়ে আমাদের সর্বপ্রকার হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে তাঁর মতামত জানা যাবে। হৃদয়হীনতাই তো মানুষকে অমানুষ করে। আমরা হৃদয়কে যত উদার করতে পারব, যত অন্যের জন্য মমতা বোধ করতে পারব, ততই হব খাঁটি মানুষ।

যিশু তখন গ্রামে গ্রামে ঘুরছিলেন।

এক গ্রামে তিনি পৌঁছেই এক ক্রুদ্ধ জনতার চিৎকার শুনলেন। এমন সময় চিৎকার করতে করতে একটি স্ত্রীলোক দৌড়ে এল। সে এসে যিশুর সামনে পড়ে গেল। তার সারা দেহ থেকে রক্ত ঝরছে। সে বলল, আমায় রক্ষা কর, আমায় রক্ষা কর। সবাই আমাকে মেরে ফেলছে।

করুণায় যিশুর চোখে জল এল। তিনি তার রক্ত মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, শান্ত হও মা। আমি তোমায় রক্ষা করব। তুমি মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ কর।

এমন সময় ক্রুদ্ধ জনতা এসে পৌঁছল সেখানে। বলল, কে তুমি? দেখতে তো তোমাকে ভালই লাগছে। সৎ মানুষ বলেই মনে হয়। তবে ঐ স্ত্রীলোকটিকে শুশ্রূষা করছ কেন?

খৃষ্ট বললেন, আহত মানুষকে সেবা করাইত' মানুষের ধর্ম।

লোকগুলো বলল, কিন্তু যে পাপী, যে নীচ তাকে কখনই কোন সৎ মানুষ প্রশ্রয় দেয় না। ঐ স্ত্রীলোকটি একটি জ্বলজ্যান্তো শয়তানী। ও না করেছে এমন পাপ নেই।

তাই বলে তাকে তোমরা এমন ইট ছুঁড়ে মারবে? নিজের গায়ে একটু ইটের আঘাত লাগলে কত কষ্ট হয়, তা কি তোমরা জান না?

জনতা চেঁচিয়ে উঠল, রাখ তোমার অত জ্ঞান। জান না বিচারক বিচার করে ঐ স্ত্রীলোকটিকে ইট মেরে মেরে হত্যার আদেশ দিয়েছেন।

যিশু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, বেশ ভাই সব। আমি তা হলে আর বাধা দেব না। যদিও তোমরা ইট মারলে আমি ব্যথা পাব, প্রতিটি ইট আমার গায়েই লাগছে বলে বোধ হবে, তবু আমি বিচারকের নির্দেশকে উপেক্ষা করব না। নিজে আমি স্ত্রীলোকটিকে ঐ গাছের সঙ্গে বেঁধে দেব, যাতে সে আর পালাতে না পারে।

উল্লাসে চিৎকার করে উঠল জনতা। এই তো সাধুর মত কথা বলেছ। তুমি একজন সত্যিকারের সাধু।

করুণাকাতর চোখে যিশু তাকালেন জনতার দিকে। বললেন, ভাই সব! আমার একটা কথা কিন্তু তোমাদের মানতে হবে। বল মানবে।

এমন মিনতিভাবে যিশু কথাগুলো বললেন যে সকলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ মানব! তোমার মত সাধুর কথা মানব না কেন? বল কি কথা মানতে হবে!

যিশু বললেন, ভাই সব নিজের নিজের মনের দিকে তাকাও। যিনি মন থেকে বিশ্বাস করেন যে তিনি জীবনে কোন পাপ করেন নি, একমাত্র তিনিই ইট ছুঁড়ে মারবেন। যিনি বিন্দুমাত্রও পাপ করেছেন ইঁট মারবার অধিকার তাঁর নেই।

জনতা থমকে গেল। সকলেই মনে মনে বিচার করে দেখল, কোন না কোন পাপ সে করেছেই। একজনও নিষ্পাপ লোক সেখানে নেই। যিশু বললেন, নিজে পাপে লিপ্ত থেকে আমি কি আর একজনকে পাপের শাস্তি দিতে পারি!

সকলেই যেন আত্মধিক্কারে মরে যেতে থাকল। যিশু বললেন, ভাই সব! পাপকে ঘৃণা করো পাপীকে নয়। পাপীও যে ঈশ্বরের সন্তান। বলে যিশু এগিয়ে গেলেন। বললেন, এসো এতক্ষণ ইঁট মেরে আমরা যে পাপ করেছি, এখন স্নেহের স্পর্শে ওর ক্ষতের রক্ত মুছিয়ে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করি!

সকলে পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে স্ত্রীলোকটির ক্ষতস্থানের রক্ত মুছিয়ে দিতে লাগলেন। ক্রুদ্ধ জনতার হৃদয়হীনতা এমনি করে দূর হয়ে গেল।

এমনি করে যিশু যখন সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে তাদের নানা উপদেশে নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত করছেন, আর সাধারণ মানুষ ক্রমেই তার পাশে এসে ভীড় করছে, তখন একদিন এক উকিল এসে হাজির হলেন তাঁর সামনে। তার ইচ্ছেটা ভাল নয়। প্রশ্নে প্রশ্নে জব্দ করাই তার লক্ষ্য। তাই সে এসে জিজ্ঞেস করল, প্রভু স্বর্গে যদি যেতে চাই, তবে আমাকে কি করতে হবে?

যিশু বললেন, এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে কি লেখা আছে বলতে পার?

লোকটি বলল, শাস্ত্রে বলে ঈশ্বরকে ভালবাস, প্রতিবেশীকেও। তবেই স্বর্গে যাবে।

যিশু বললেন, তবে ত' তুমি জানই। তবে তাই করগে।

লোকটি বল্‌ল, কিন্তু প্রতিবেশী কে তা চিনব কি করে?

যিশু বললেন, তবে শোন একটা গল্প বলি। তোমরা তো জান, জেরুজেলাম থেকে জেরিকো যাবার পথটা ভাল নয়। পথে অনেক দস্যু তস্করের দল আছে। তারা সুযোগ পেলেই দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে পথিকদের সব কেড়ে নেয়। কখনোও কখনো মেরেও ফেলে।

একদিন একজন ইহুদী ঐ পথে জেরুজেলাম থেকে জেরিকো যাচ্ছিলেন। পথে একদল দস্যু আক্রমণ করল তাকে। একা পথিক বাধা দিতে পারল না বরং আহত হয়ে পড়ে রইল। দস্যুরা তার সব কিছু নিয়ে চলে গেল।

বেশ খানিকক্ষণ পরে সেই পথে এলেন জেরুজেলাম স্বর্ণমন্দিরের পুরোহিত। লোকটা মানুষের পদ শব্দে 'জল, একটু জল' বলে কেঁদে উঠল। থমকে দাঁড়ালেন পুরোহিত। লোকটার দিকে নজর পড়ল তাঁর। তিনি বুঝলেন ডাকাতের আক্রমণেই লোকটার ঐ দশা হয়েছে। তাহলে ডাকাতরা কাছেই আছে। তিনি আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়ালেন না। তিনি ঐ আহত লোকটার পাশ কাটিয়ে দ্রুত চলে গেলেন।

একটু পরে ঐ মন্দিরের ঐ পুরোহিতের এক চেলা এসে হাজির হল সেখানে।

লোকটা মানুষের কণ্ঠস্বর পেয়ে ডাকল। বলল জল, একটু জল।

চেলা বল্‌ল, তা এমন কাণ্ডটা করলে কে?

লোকটা বহু কষ্ট করে বল্‌ল, ডাকাত।

ডাকাত! ওরে বাবা! লাফিয়ে উঠল চেলাটি তারপর দিল দৌড়। এলাকাটা যত তাড়াতাড়ি পার হওয়া যায়।

এমন সময় গাধায় চড়ে সেখানে হাজির হল এক সামরীয় ব্যক্তি। সে ব্যবসায়ী দ্রুত যাওয়ার দরকার তার। কিন্তু তবু লোকটিকে দেখে গাধা থামাল সে। নেমে আহত

লোকটিকে চিৎ করে শোয়াল। পরিস্কার দেখা যাচ্ছে লোকটাকে। সে একজন ইহুদী। ইহুদীদের সঙ্গে সামরীয়দের দীর্ঘকালের শত্রুতা চলছে। অতএব লোকটা শত্রু। তবে কি সামরীয় বণিক তাকে ফেলে চলে যাবে?

না! আহত আতুরের সঙ্গে কোন শত্রুতা চলে না। সে সকলের ভালবাসার পাত্র, তাকে উপেক্ষা করা হৃদয়হীনতা। এ কথা গুলি ভেবে সামরীয় বসে পড়ল তার পাশে। কাপড় ছিঁড়ে মুছিয়ে দিল তার ক্ষতস্থান। তারপর বল্‌ল, কেমন বোধ করছ?

ইহুদীটি বল্‌ল, বড্ড শীত করছে।

সামরীয়টি নিজের কোট খুলে তাকে পরিয়ে দিল। বল্‌ল, তুমি কি সামনের সরাইখানা পর্যন্ত যেতে পারবে?

লোকটি বলল, আমার চলবার শক্তি নেই।

তখন সামরীয়টি তাকে নিজের গাধার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গেল সামনের সরাই খানায়। নিজে গেল পাশে পাশে হেঁটে। সেখানে সরাইওয়ালাকে বল্‌ল, ভাই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে বিশেষ কাজে। এই আহত লোকটির সেবা করে তাকে বাঁচিয়ে তোল। এই দুটি স্বর্ণমুদ্রা রাখ। যদি আরও খরচ হয়, হিসেব রেখো। আমি ফিরবার পথে শোধ করে দেব। আমি চলি। আমার এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে।

এই গল্প শেষ করে যিশু বললেন, এই পুরোহিত, তার চেলা আর সামরীয়ের মধ্যে কাকে তোমার প্রতিবেশী বলে মনে হল।

উকিলটি বললেন, ঐ দয়াবান সামরীয়ই প্রকৃত প্রতিবেশী।

যিশু বললেন, তবে তুমিও ঐ সামরীয়টির মত হবার চেষ্টা করো। অপরের প্রতি হৃদয়হীনতা ঈশ্বরেরই বিরুদ্ধে যাওয়া। তুমি অপরকে যত ভালবাসবে তুমি ততই মহৎ মানুষ হবে।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে

(ভারতীয় ইতিহাস থেকে)

এ বিষয়ে আমরা তোমাদের তিনটি গল্প বলব। একটি গল্প শঙ্করাচার্যের, একটি শ্রীরামকৃষ্ণের ও একটি বিবেকানন্দের। এ তিনটি গল্প থেকেই বোঝা যাবে যে কোন সত্যদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষই অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন করেন না। এটা একটা কুসংস্কার। আমরা যুক্তি দিয়ে বিচার করলেই বুঝব কি অর্থহীন এই সংস্কার।

এবার গল্প গুলো বলা যাক।

॥ শ্রীশঙ্করাচার্যের গল্প ॥

বুদ্ধদেবের মৃত্যুরও প্রায় বারোশ' বছর 'পর শঙ্করাচার্যের জন্ম হয়। সেটা আজ থেকেও প্রায় এগারশ বছর আগের কথা। তখন বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যেও বিকার দেখা দিয়েছে। শঙ্করাচার্য সেকালের সমস্তশাস্ত্র পড়ে, সমস্ত বৌদ্ধ পণ্ডিতদের পরাস্ত করেন এবং ব্রাহ্মণ্যমতের প্রতিষ্ঠা করেন। আজও ভারতবর্ষের নানা স্থানে শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত মঠ আছে। এর মধ্যে দ্বারকায় সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ, দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গেরী মঠ এবং বদরিকাশ্রমে যোশী মঠ বিখ্যাত।

এই মহাপণ্ডিত যখন সারা ভারতে ধর্মপ্রচার করে চলছেন, ঠিক সেই সময়েই একদিন কাশীর ঘাটে তিনি গেছেন স্নান করতে। ফিরবার পথে দেখেন এক চণ্ডাল চার-চারটে কুকুর নিয়ে চলছে পথ দিয়ে। সরু রাস্তা। অতএব কোন কথা না বলে শঙ্করাচার্য এক পাশে সরে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালেন। চণ্ডাল কুকুর নিয়ে তার পাশ কাটিয়ে এল। তারপরই ঘুরে দাঁড়াল চণ্ডাল। বল্‌ল, তুমি ঠাকুর শঙ্করাচার্য নও?

শঙ্করাচার্য বল্‌লেন, হ্যাঁ! ঠিকই চিনেছ।

চণ্ডাল বলল, তুমি না ঈশ্বর মানুষ সব এক—এই সব কথা বলে বেড়াও! তুমি না অদ্বৈতবাদী! তুমি সরে দাঁড়ালে কেন?

শঙ্করাচার্য বল্‌লেন, চণ্ডাল বা কুকুর ত' অপবিত্র। তাই ভয়ে সরে গেছিলাম। এতে এত ভেদ কথা বলছ কেন?

চণ্ডাল বল্‌ল, অন্যে এমন করলে কিছু বলতাম না। কিন্তু ঠাকুর, তুমিও মানুষে মানুষে এত ভেদ ভাব? আমাকে বা আমার কুকুরকে ছুঁলে তুমি অপবিত্র হবে কেন ঠাকুর? তা হলে তোমাকে ছুঁলেও কি আমি অপবিত্র হব? আচ্ছা ঠাকুর, তোমার আমার দেহ কি একই জিনিষে তৈরী নয়? তোমার আত্মা আর আমার আত্মা কি একই বস্তু নয়? ঠাকুর! তুমিই ত' বল যে সকলের অন্তরে একই শুদ্ধ আত্মা বিরাজ করে। তা হলে আমাকে ছুঁলে তুমি অপবিত্র হবে কেন ঠাকুর!

শঙ্করাচার্যের মনে হল তাঁর গালে কে ঠাস করে এক চড় বসাল। তাঁর মনে হল বাইরের এই শরীর, আকার ইত্যাদিতে যে পার্থক্যই থাক, সকলের ভেতরেই ত' সেই এক শক্তি। তাঁর মনে হল এত দিনে তাঁর অন্ধ চোখে দৃষ্টি পেলেন। তাঁর সত্য জ্ঞান হল। তাঁর দার্শনিকতা সম্পূর্ণ হল। তিনি মনে মনে সেই চণ্ডালকে প্রণাম করলেন।

সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মনে মনে সৃষ্টি করলেন তাঁর বিখ্যাত শ্লোকগুলি এদের নাম মনীষা-পঞ্চক। এই শ্লোক পঞ্চকের প্রত্যেক শ্লোকের শেষেই লেখা আছে এই বিশ্ব সৃষ্টিকে যে আমাকে অভেদের দৃষ্টিকে দেখাতে শেখাল, সে ব্রাহ্মণই হোক, আর চণ্ডালই হোক, সেই আমার গুরু।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর গল্প ॥

তোমরা জান রামকৃষ্ণদেব নানাজনের কাছে নানা মতে ঈশ্বর সাধনা করেন। সব সাধনা করেই তাঁর মনে হয় ধর্মে ধর্মে এত ভেদ—এ সবই বাইরের ব্যাপার। আসলে যত মত—তত পথ। সব পথ দিয়েই আমরা একই স্থানে গিয়ে উপস্থিত হই।

তখন রামকৃষ্ণদেব তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত হয়েছেন। দুজনেই

থাকেন দক্ষিণেশ্বরে-পঞ্চবটীতে। দিনরাত তাদের নানা আলোচনা হয়। কখনও দুজনেই ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকেন।

পঞ্চবটীর সামনে দিয়ে তরতর করে বয়ে চলেছে গঙ্গা। দুই সন্ন্যাসী সামনে ধুনী জ্বালিয়ে বসে বেদান্তের আলোচনায় মেতে উঠেছেন। তোতাপুরী বলছিলেন, এই যে জড় জীব সবই—এ সবই এক পরমাত্মার অংশ—তারই নানা রূপ।

এমন সময় সেই পঞ্চবটীর পাশ দিয়ে হেঁটে চলছিল এক সাধারণ গ্রাম্যচাষী। মাথায় তার মস্ত বোঝা। পঞ্চবটীর বটের ছায়ায় বসল লোকটি। কোমরের গামছা খুলে গায়ের ঘাম মুছল। গঙ্গার শীতল বাতাস বোধ হয় তার ক্লান্তি কমিয়ে দিল খানিকটা। হয়ত একটা বিড়ি খাবার লোভ হল তার। দিয়াশলাই তখন এত সহজে পাওয়া যেত না। হঠাৎ তার নজরে পড়ল সন্ন্যাসীদের সামনে ধুনীতে আগুন জ্বলছে। সে উঠে এসে একটা কাঠি দিয়ে ধুনীর আগুন থেকে বিড়িটা ধরিয়ে নিল।

তা দেখে লাফ দিয়ে উঠলেন তোতাপুরী। ধুনীর আগুন সন্ন্যাসীর কাছে প্রাণের চেয়েও পবিত্রবস্তু। তা থেকে আগুন নিয়ে লোকটা সেই ধুনীকে এঁটো করে দিল। তোতাপুরী হাতের চিমটে তুলে লোকটাকে খুন করতে গেলেন।

তা দেখে রামকৃষ্ণ বিকট শব্দে হা হা করে হেসে উঠলেন।

তোতাপুরী থমকে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, হাসছ কেন?

কে দেবে উত্তর! রামকৃষ্ণ হেসেই চলেছেন। পাগলের মত হাসছেন আর তোতাপুরী ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করে চলেছেন হাসছ কেন, হাসছ কেন? অবশেষে চিমটে ফেলে দু হাতে ধরে বিরাট ঝাঁকুনি দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। এবারে তাঁর হাসি থামল। তোতাপুরী আবার বললেন, এত হাসছ কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, এই তোমার ব্রহ্ম জ্ঞান! এই তুমি বল জড় প্রাণী সবই এক ব্রহ্মের প্রকাশ! তা যদি হয় তবে ধুনীর আগুন, কাঠি, বিড়িতে তফাৎ কি? তা হলে ও লোকটার অপরাধ কোথায়? এই যদি তোমার বিচার তবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তোমার পার্থক্য কোথায়? বেদান্তবাদীরও এতখানি ভেদজ্ঞান! তাই দেখে আমি হাসছিলাম।

তোতাপুরী লজ্জায় লাল হলেন। জড়িয়ে ধরলেন রামকৃষ্ণের দুটি হাত। বললেন, ছিঃ ছিঃ রাগের বশে এ কি করতে চলেছিলাম! আমাকে ভেদ বুদ্ধি পেয়ে বসেছিল! ছিঃ ছিঃ।

সেই থেকে তোতাপুরী আর কখনও অস্পৃশ্যতা মানেন নি, জীবনে তিনি আর রাগও করেন নি।

॥ স্বামী বিবেকানন্দের গল্প ॥

নরেন্দ্রনাথ তখন পুরোপুরি সন্ন্যাসী। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মৃত্যু হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ শিষ্যদের মধ্যে বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হয়েছেন। সারা ভারতবর্ষ পরিব্রাজকের মত পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন।

তখন বিবেকানন্দ চলেছেন দক্ষিণাত্যের পথে। কত কি ভাবনা মনে। সারা ভারতবর্ষের অতীত বর্তমান তাঁর মনকে আলোড়িত করছে। ভবিষ্যতের স্বপ্ন জাগছে মনে। স্বামীজী চলতে চলতে দেহে মনে ক্লান্তি বোধ করছেন।

এমন সময় তিনি এক দরিদ্র পল্লীর ভেতর দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন একটা ছোট চারপাই পেতে একজন বৃদ্ধ তামাক খাচ্ছে। তা দেখে তাঁর বড় তামাক খাবার লোভ হল। মনে হল একটু তামাক টানলে মন ও দেহের ক্লান্তি কমে যাবে। তিনি গিয়ে লোকটির কাছে এক ছিলুম তামুক চাইলেন।

লোকটি স্বামীজীকে আপাদমস্তক দেখল। তারপর বল্‌ল, বাপুহে,। তোমাকেত' দেখছি সন্ধ্যাসী! তোমাকে এক ছিলুম তামুক দিলে ত' আমার পূণ্যি। কিন্তু তুমি কি আমার হুকো কলকেয় তামুক খাবে? আমি কিন্তু জাতে মেথর।

থমকে গেলেন স্বামীজী। চলে এলেন।

কিন্তু একটু গিয়েই তাঁর মনে হল, একি করলাম আমি। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর কাছে আবার জাতিভেদ। তার কাছে আবার অস্পৃশ্যতা! এগুলো সবই তো এই বাইরের খোলটাকে নিয়ে। কোন্ বংশে এই শরীরটা জন্মেছে তাতে আত্মার কি? আমার ভেতরেও যে আত্মা—ওর ভেতরেও তাই।

স্বামীজী ফিরে এলেন। বৃদ্ধটির হাত থেকে হুকোটা টেনে নিয়ে ওর গা ঘেঁসে খাটিয়ায় বসে ওর হুকোকলকেতেই তামুক টানতে লাগলেন।

ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে
(ইউরোপীয় ইতিহাস থেকে)

এবার তোমাদের এমন একজন মানুষের কথা বলব যিনি সত্যের স্বার্থে, আজীবন লড়াই করে গেছেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে—ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে। তিনি অত্যাচারে মাথা নত করেন নি, মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও ভয় পান নি। তাকে হত্যা করে যারা ভেবেছিল সত্যকে খুব চাপা দেওয়া গেল, বিশ্বশুদ্ধ আজ তাদের ধিক্কার দেয়। এত বড় সত্যনিষ্ঠ মানুষটি কে জান? তিনি একজন বিজ্ঞানী—নাম তার, জিওনার্দ ব্রুণো।

তখন ইউরোপে চার্চের দোর্দণ্ড প্রতাপ। সব কিছুর মাপকাঠি বাইবেল। বাইবেলে যা বলা হয়েছে, তার বাইরে যা কিছু সব মিথ্যা। বাইবেলের কথা যদি মান, তোমার সাত খুন মাপ। কিন্তু যদি বাইবেলের বিরুদ্ধে কিছু বল—তা হলেই হবে ধর্মীয় বিচার। তার নাম ইনকুইজিশন। ইনকুইজিশনে অপরাধী প্রমাণ হলে একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। আর ইনকুইজিশানের বিচার বা অপরাধ প্রমাণ হওয়া একটা কথার মার-প্যাঁচ মাত্র। বিচার পতিরাই যেখানে অভিযোগ আনছেন সেখানে বিচারের অর্থ

যে কি, তা সবাই জানে। লোকে তাই ইনকুইজিশনের নামে শিটিয়ে থাকত! বাইবেলের সব কথাকে ধ্রুব সত্য বলে মানত। এমনই ছিল তখনকার ধর্মান্ধতা।

অবশ্য বাইবেলের কোন কোন কথা যে সত্য নয়, তা বুঝবেই বা কে, আর বলবেই বা কে? এসব করতে গেলে ত' বিদ্যেবুদ্ধি চাই। চার্চ ছাড়া তখন লেখাপড়ার পাটই ছিল না। চার্চের যাজকেরা লিখতে বা পড়তে জানতেন। কোন কোন ধনী ব্যক্তি আর পাঁচটা খেয়ালের মত লিখতে পড়তেও শিখতেন কিন্তু ঐ মাত্র। স্বয়ং রাজা যেখানে কোন ক্রমে সই করতে জেনে কাজ চালাতেন, সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা বুঝতেই পারছ। তাই সে সময়ে বিদ্যেচর্চার ব্যাপারটা চার্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর তাই যাজকেরাই ছিলেন সমাজের সর্বেসর্বা। আর তাই কোথাও কোথাও স্বয়ং রাজাও চার্চের কাছে মাথা নত করে রাখতেন।

এমন সময় ইটালীর এক ছোট্ট শহর নোলাতে ব্রুণোর জন্মগ্রহণ। সেটা ১৫৪৮ সালের কথা। ব্রুণোর জন্মের মাত্র পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন আর এক বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনি নিজেও ছিলেন যাজক। কিন্তু হলে কি হবে। যুক্তিবাদী মন ছিল তাঁর। সব কিছু বিশ্লেষণ করে বুঝে নিতে চাইতেন। আর তা করতে গিয়েই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বাইবেলের ওল্ড টেস্টমেণ্ট-এর অনেক কথাই সত্য নয়। বাইবেল যে বলছে এই গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি সব কিছুই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে—পৃথিবীর জন্যই সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে—এ সব কথা যে মিথ্যা তা কোপারনিকাস বুঝে ফেলেছিলেন তার চল্লিশ বছর বয়সে। কিন্তু বুড়ো বয়স পর্যন্ত এ সবকিছুই তিনি প্রকাশ করেন নি ভয়ে। এসব তিনি জানিয়েছিলেন তার দু একজন বন্ধুকে। তারা বুড়ো কোপারনিকাসকে তার আবিষ্কারের কথা গুছিয়ে লিখতে বলেছিলেন। তারা সে বই ছাপাতে চার্চের অনুমতি চেয়েছিলেন। বুড়ো যাজক কোপারনিকাসকে তারা সন্দেহ করেন নি। চার্চ সে বই ছাপাবার অনুমতি দিয়েছিল। শোনা যায় মৃত্যু শয্যায় শুয়ে কোপার নিকাস তার পুরো বই মুদ্রিত অবস্থায় দেখে গেছিলেন।

বইটা যখন সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে আলোড়ন তুলল, তখন চার্চের টনক নড়ল। কিন্তু কোপারনিকাস তখন চার্চের আওতার বাইরে। কি করবেন চার্চের কর্তারা। আজীবন বিশ্বস্ত যাজক কোপারনিকাস মরবার আগে যে বাইবেলের বিরুদ্ধ কথা লিখে মরবে, কে কল্পনা করেছিল তা? ফলে চার্চের কর্তা হাত কামড়ালেন। পারলে কবর থেকে টেনে তুলে ধর্মীয় বিচার করতেন বজ্জাত বুড়োটার। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। অতএব বইটাই নিষিদ্ধ করা হল। দু একখানা বই রইল কোন কোন চার্চের লাইব্রেরীতে। বাকী বই সংগ্রহ করে পোড়ান হল। বাইবেল বিরুদ্ধ সত্যকে এমনি করে ছাই চাপা দিল চার্চ। কিন্তু আগুন যে রয়েই গেল—সে খেয়াল কেউ করল না।

এ সব কাণ্ড ঘটে গেল ব্রণোর জন্মের অনেক আগে।

ব্রুণোর বাল্যকালের কথা সঠিক এবং বিস্তারিত ভাবে জানা না গেলেও, এটুকু জানা যায় যে অতি শৈশবেই তিনি বাপ-মা হারান। কিন্তু এই প্রখর বুদ্ধি বালক নজরে পড়ে যায় চার্চের। এমন বুদ্ধিমান ছেলেরই ত' যাজক হওয়া দরকার।

সেকালে চার্চের যাজকদের দুটো দল ছিল। এদের মধ্যে শক্তি বেশি ছিল ডমিনিকান দলের। তারাই ব্রুণোকে নিয়ে এল চার্চে। তারাই তার খাওয়া দাওয়া থাকার ব্যবস্থা করল। আর করে দিল পড়াশুনার ব্যবস্থা। ব্রুণোর সামনে যেন স্বর্গের দরজা খুলে দেওয়া হল। ব্রুণো পড়াশুনা নিয়ে এত মেতে উঠল যে ঐ বিশাল লাইব্রেরীর একখানা বইও বাদ রাখল না। যে কেউ যে কোন দরকারে কোন কিছুর হদিশ চাইলেই বলে দিতে পারে। সবার চোখে মুখেই বিস্ময়। অতটুকু ছেলেকে প্রসংসা না করে এমন লোক কোথায়! চার্চের কর্তারাও খুশি। এমন পণ্ডিতই ত' চাই। না হলে সমাজে চার্চের সম্মান বাড়বে কেন? তারা নিজেরাই ব্রুণের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করে বেড়াতে লাগলেন।

কিন্তু এত কি পড়ে ব্রুণো? তার মনের আসল কথা জানত না কেউ। অনেক আগেই বাইবেলের পুরোণ অনুশাসন বা ওল্ড টেস্টমেণ্টের সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে তার মনে। বই এর পর বই পড়ে ব্রুণো খুঁজে চলেছে তার মতের সমর্থন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সব বই-ই সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে কি যেন বলতে গিয়ে বলছে না। আসল কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছে। তবে কি তার আগেও অনেকেই সন্দেহ করেছে ঐ তত্ত্বকে।

এমন সময় ব্রুণোর হাতে পড়ল ধুলো মাখা একটা আবহেলিত বই। তার পাতা খুলে চমকে উঠলেন ব্রুণো। এই ত' কোপারনিকাসের সেই নিষিদ্ধ বই। দুর্ভিক্ষের সময় খাবার পেলে একটা উপবাসী লোক যেমন হাউ হাউ করে গিলতে থাকে, ব্রুণো বইটা তেমনি করে পড়ে ফেল্লেন। তবে ত' তিনি যা ভেবেছেন তা মিথ্যে নয়। বৃদ্ধ পণ্ডিত কোপারনিকাস ত' সেই কথাই লিখেছেন। ব্রুণো শত শত প্রণাম করল বৃদ্ধকে। হে নির্ভীক পণ্ডিত! আপনি আমার সব সংশয় কাটিয়ে দিলেন। মনে মনে বল্লেন ব্রুণো। মনের আনন্দে কথাগুলো মঠের এক বন্ধুকে বলেও ফেললেন। কিন্তু বন্ধুটি বাইবেল বিরোধী এ সব কথা শুনে এত বিচলিত হল যে সঙ্গে সঙ্গেই তা চার্চের অধিকর্তাকে জানিয়ে দিল।

অধিকর্তা ডাকলেন ব্রুণোকে। তার পাণ্ডিত্য, তার খ্যাতি তার ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে তিনি ব্রুণোকে বললেন, একদিনের মধ্যে তুমি তোমার কৃত কর্মের জন্য অনুতাপ করে প্রকাশ্যে মার্জনা চাইবে। নতুবা—

নতুবা আর কিছুই করতে পারলেন না তিনি। ব্রুণোকে পরদিন থেকে আর চার্চে পাওয়া গেল না। এক অভিযাত্রী দলের সঙ্গে মিশে দুর্গম আলপ্‌স্‌ পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তিনি চলে গেছেন সুইজারল্যাণ্ডে।

সেখানে বসে ব্রুণো কোপারনিকাসের তত্ত্বকে বিচার বিশ্লেষণ শুরু করলেন। মহাকাশ সম্পর্কে গবেষণার একটা ভিত্তি তৈরী করলেন ব্রুণো। কোপারনিকাস ভেবেছিলেন এ বিশ্বজগতের কেন্দ্র বুঝি ঐ সূর্য। সে স্থির। তার চারদিকে ঘুরে মরছে অন্য সকল গ্রহ নক্ষত্র। কিন্তু ব্রুণো প্রমাণ করলে যে সূর্যও স্থির নয়। সেও নিজের অক্ষের ওপর ঘুরছে। আর যে কটি গ্রহ নক্ষত্র আমরা জানি তার থেকেও অনেক অনেক বেশি গ্রহ নক্ষত্র ঘুরছে সূর্যকে কেন্দ্র করে। ব্রুণোর কথা যে সত্যি তা প্রায় দুশো বছর পরে প্রমাণ হল নেপচুন আর প্লুটো আবিষ্কার হওয়ায়।

ব্রুণো বাইবেলের কথার আরও ভুল দেখালেন। বাইবেল বলছে, এ বিশ্বজগৎ বিধাতা যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি আছে, তেমনি থাকবে। ব্রুণো দেখালেন তা কখনই সত্য নয়। তিনি দেখালেন অন্য সব কিছুর মত এ বিশ্ব জগতের ধ্বংস ও ক্ষয় আছে। আর আমাদের এই যে জগত সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, তার মত আরও অসংখ্য জগত রয়েছে মহাশূন্যে। এসব কথা ব্রুণো সুইজারল্যাণ্ড থেকে প্রচার করে চললেন।

বহুদেশের চার্চ তাকে বিপদজনক লোক বলে ঘোষণা করল। তাতেও ভয় পেলেন না ব্রুণো। তিনি বললেন, সত্য প্রচারই ঈশ্বরের আদেশ। বাইবেল প্রচার নয়। এতে চার্চ আরও ক্ষেপে গেল। তারা জিওভানি মবেনিগো নামে এক তরুণকে গোপনে নির্দেশ দিল, যেমন করে পার ব্রুণোকে গ্রেপ্তার করে ইটালীতে নিয়ে এসো।

মবিনিগো ক্রমাগত চিঠি লিখতে থাকলেন ব্রুণোকে। চিঠি পড়ে মনে হতে থাকল ছেলেটা ব্রুণোর মতেই বিশ্বাস করে। সে আরও জানতে চায়। হতে চায় তাঁর ছাত্র। এমন জ্ঞান পিপাসু ছেলেটিকে কি ফিরিয়ে দেবেন ব্রুণো? তিনি তাকে তার কাছে আসতে বললেন। মবিনিগো ব্রুণোর ব্যক্তিগত ছাত্র ও বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠলেন। আর সেই সুযোগ নিয়ে ১৫৯২ সালের ২৩মে তারিখে গুরুকে ধরিয়ে দিলেন তিনি।

এরপর আট বছর ধরে চল্‌ল ব্রুণোর ওপর অকথ্য অত্যাচার। চার্চের এক দাবী, ব্রুণোকে বলতে হবে, এতদিন আমি যা বলেছি তা ভুল। বাইবেলই সত্য। এতদিন ভুল প্রচারের জন্য আমি অনুতপ্ত।

ব্রুণো অনড় হয়ে রইলেন। বললেন, যা সত্য আমি তার বিরুদ্ধ কথা বলব না।

ব্রুণোর বিরুদ্ধে চার্চ ইনকুইজিশন শুরু করল। তিনি তার বিরুদ্ধে আনা একশ

ত্রিশ দফা অভিযোগ যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করলেন। কিন্তু কে মানছে সে সব। ধর্মান্ধ চার্চের বিচারকেরা ব্রুণোকে অপরাধী বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর দণ্ড হল মৃত্যু।

একজন বিচারক বললেন, দণ্ড শুনে ভয় হচ্ছে না আপনার?

ব্রুণো বললেন,দণ্ড শুনে আমার যা ভয় হচ্ছে,ঈশ্বরের নাম করে ঐ দণ্ড উচ্চারণ করতে আপনার তার চেয়ে বেশি ভয় হওয়া উচিত।

শুনে নিশ্চয় বিচারকেরা খুশি হলেন না। তবু খুশির ভান করে তারা বললেন, পুণ্য চার্চকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই অপরাধীর রক্তপাত না করে মৃত্যু দণ্ড দেন।

কথাটা শুনলে মনে হয়, বিচারকেরা বুঝি বা খুবই করুণা দেখালেন ব্রুণোর প্রতি। আসলে তা নয়। এর প্রকৃত অর্থ হল, ব্রুণোকে যেন জ্যান্তো আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।

রোমের চার্চের পাশে দণ্ডের স্থান নির্দিষ্ট হল। নির্দিষ্ট দিনে ভোরবেলা গির্জার ঘণ্টা বাজতেই পুরো পোষাক পরে যাজকেরা বাইরে এসে মৃত্যুকালীন শোক গান গাইতে থাকলেন। এক বিশাল মিছিল ব্রুণোকে সামনে রেখে এগিয়ে চল্‌ল। স্বয়ং বিশপ, চার্চের যাজকের দল, রাজকর্মচারীরা অভিজাতেরা রইলেন সঙ্গে সঙ্গে। রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার কৌতূহলী জনতা।

বহু কষ্টে হেঁটে চলেছেন ব্রুণো। তাকে পরান হয়েছে হলদে রং-এর পোষাক। তাতে কালো রং দিয়ে আকা শয়তানের নানা ছবি। তার মাথায় দেওয়া হয়েছে মস্ত ভারী শিকল। পাছে তিনি জনগণকে কিছু বলে দেন, তাই আগেই যাজকেরা তার জিব টেনে ধারাল ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে দিয়েছেন। যন্ত্রণা, পরিশ্রম, অসম্মান—সব কিছুর মধ্যেও মাথা উঁচু করে চলেছেন ব্রুণো। দণ্ডস্থানে এসে শেষবার মার্জনা চাইতে বলা হল ব্রুণোকে। কিন্তু তিনি ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

যাজকের অনুচরেরা তাকে টেনে নিয়ে বাধল উঁচু খুঁটিতে। আগুন ধরিয়ে দিল ধর্মান্ধের দল। আগুনের শিখা বোধ হয় লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে ব্রুণোর সব দুঃখকে মুছে দিতে চাইল। তার সব লজ্জাকে দিল আবরণ। তবু তারই ফাঁকে যতদূর দেখা গেল মাথা উঁচুই করে আছেন বিজ্ঞানী। তার মুখে এতটুকু কাতরোক্তি নেই।

১৬০০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী শহীদ হলেন ব্রুণো। প্রায় তিন শ'বছর পর রোমের ঐ চত্বরের ধর্মান্ধের বিরুদ্ধে অমর-সংগ্রামী ব্রুণোর স্মৃতি স্তম্ভ গড়ে তোলা হল। ঐ স্মৃতি স্তম্ভের পাশে দাঁড়ালে সকলেরই মন ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ধিক্কার দিয়ে ওঠে।

আমাদের সংগ্রাম

পরবশ্যতার বিরুদ্ধে

পরবশ্যতা : অপরের বশ্যতা মেনে নেওয়া। পরবশ্যতা থেকেই জন্মে পরাধীনতা। আমরা দেহে বা মনে পরবশ্যতা চাই না।

কীর্তি : মহৎ কাজ। এখানে বিদ্রূপ করে খারাপ কাজকে কীর্তি বলা হয়েছে।

যাদুবলে : অলৌকিক কোন শক্তি দ্বারা।

মুখে রুচছে না : মুখে ভাল লাগছে না।

বিশ্বজয়ী : যারা বিশ্বজয় করেছে।

বিভ্রান্ত : হতচকিত।

বিমূঢ় : বোকা বনেছেন, বুদ্ধিতে কুল পাচ্ছেন না।

দুর্ব্যবহার : খারাপ আচরণ।

যোগ্য : উপযুক্ত।

আদিমাতা : প্রথম মা। যার থেকে অন্যদের উৎপত্তি।

স্বদেশ : নিজের দেশ।

মতিভ্রম : বুদ্ধি নষ্ট হওয়া।

স্বার্থ : নিজের ভাল।

সোল্লাসে : উল্লাসের সঙ্গে।

গিরি সংকট : দুটি পাহাড়ের মিলন স্থল।

উপত্যকা : দুটি পাহাড়ের মাঝের সমভূমি।

বিচরণ : ঘুরে বেড়ান।

অবকাশ : অবসর, অকাজের সময়।

১. গরু হারিয়ে স্বর্গরাজ্যের কি অবস্থা হয়েছিল ? তা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২. ইন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনার উত্তরে কুকুরেরা কি বলেছিল ? তাদের এমন উত্তর দেওয়ার কারণ কি ?

৩. কুকুরদের আদিমাতা কে ? সে কেন ইন্দ্রকে সাহায্য করতে চাইল ? এজন্য ইন্দ্র বা কুকুরেরা কে তাকে কি বলেছিল ? সরমাই বা কি বলেছিল ?

৪. ইন্দ্রের রাজসভার ঘটনাটি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

৫. সরমা কোথায় কোথায় কিভাবে গরু চোরদের খুঁজেছিল ? কি চিন্তায় কেমন ভাবে সে নিজের হতাশা ঝেড়ে ফেলেছিল ?

৬. পণি কারা ? তাদের পরিচয় দাও। তারা কোথায় সরমার সন্ধান পেয়েছিল ?

৭. কিভাবে সরমা শেষ পর্যন্ত গরুদের সন্ধান পায় ?

৮. 'পণিরা অবাক'—কেন ? তাদের বিস্ময় কাটল কি ভাবে ?

৯. পণিরা কি ভাবে সরমাকে প্রলুব্ধ করেছিল ? কি কি বাধার কথা বলেছিল ? সরমা কি বলে তা উপেক্ষা করল।

১০. সরমার গল্প থেকে তার চরিত্রের কোন্ দিকটি তোমাকে আকর্ষণ করে ? কেন ?

অপশিক্ষার বিরুদ্ধে

প্রান্ত ঃ কিনারা।

সমবয়সী ঃ সমান বয়স যাদের।

দুশ্চিন্তা ঃ খারাপ ভাবনা।

শুকদেব ঃ ব্যাসদেবের মহাপণ্ডিত পুত্র।

শ্রুতিধর ঃ শোনা মাত্র যে সব মনে রাখতে পারে।

অসাধ্য সাধন ঃ যা সহজে করা যায় না তা করা।

ক্রমাগত ঃ অনবরত।

অপশিক্ষা ঃ ভুল শিক্ষা ও কু-শিক্ষা।

মর্মোদ্ধার ঃ মর্ম উদ্ধার, ভেতরের সত্য জানা।

পরিকল্পনা ঃ উপায় চিন্তা করা।

শুদ্ধ ঃ পবিত্র, নির্মল।

নির্জলা ঃ জলশূন্য, জল না খেয়ে।

নিষ্ঠা ঃ দৃঢ় বিশ্বাস, অনুরাগ ও মনোনিবেশের সঙ্গে কোন কাজ করা।

সহজ-পাচ্য ঃ সহজে হজম হয়ে যায়।

১. উদ্দালক ঋষি কে ছিলেন। তাঁর ছেলেবেলার কথা বল। তাঁর দুশ্চিন্তাটা কি ছিল?

২. শ্বেতকেতু কে? তাকে নিয়ে তার বাবার কি দুশ্চিন্তা ছিল? তিনি দুশ্চিন্তা কাটাতে কি ব্যবস্থা করলেন? তাতে শ্বেতকেতুর কি আপত্তি ছিল?

৩. শ্বেতকেতুর বাবার ওপর অভিমান হ'ল কেন? এজন্য সে কেমন ব্যবহার করল? কি প্রতিজ্ঞা করল।

৪. ছেলে ফিরে এলে তাকে দেখে উদ্দালকের কি কি মনে হয়েছিল? তিনি কি ব্যবস্থা করলেন?

৫. উদ্দালক প্রকৃত-শিক্ষা বলতে কি বুঝতেন? শ্বেতকেতুর মধ্যে তা ছিল কি? কিভাবে তা বোঝা গেল?

৬. উপবাসে শ্বেতকেতুর কোন্ দিন কি অবস্থা হয়েছিল? শেষ দিন কি হ'ল?

৭. শ্বেতকেতু কোন্ পরীক্ষার ভেতর দিয়ে কি ভাবে অপশিক্ষার প্রভাব কাটিয়ে উঠল?

৮. অপশিক্ষা কাকে বলে? কি ভাবে সেই শিক্ষা অতিক্রম করা যায়?

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে

কুসংস্কার : ভুল যুক্তিহীন ধারণা, বিচিত্র গোড়ামি। যেখানে এ বিশ্বাসকে খারাপ ভাবা হয় তাকেই বলে কুসংস্কার।
রাজগীর : শব্দটা 'রাজগৃহ'-র অপভ্রংশ ।
বীথি : দু-পাশে গাছে ঢাকা ছায়াময় পথ।
উষ্ণপ্রস্রবণ : গরম জলের স্বাভাবিক ফোয়ারা।
বিক্ষুব্ধ : রাগ পোষণ করা।
সূক্ষ্ম : চুলচেরা গভীর।
আকৃষ্ট : যারা আকর্ষণ বোধ করেছেন।
বেণুবন : রাজগীরের যেখানে বুদ্ধদেব থাকতেন।
চতুর্মাগ : চার রাস্তা (চৌমাথা)।
তিরস্কার : বকাঝকা, কটু কথা ।
বেদজ্ঞ : যিনি বেদ জানেন।
তথাগত : বুদ্ধদেবকে বলা হ'ত।

১. বুদ্ধদেবের বাণী শুনতে কেন লোকে ছুটত? কেন ভীড় বেড়েই চলেছিল!

২. পুণ্ডরীকাক্ষের আশ্রয় চাকরটির পক্ষে বোঝা হয়ে উঠেছিল কেন? সে কোথায় কেন গেল?

৩. ধনঞ্জয় কে? তাকে তার বাবা কি বললেন? উত্তরে সে কি বলল এবং করল?

৪. ধনঞ্জয়! সর্বনাশ হয়েছে। কে কাকে একথা বললেন। তিনি কেন সর্বনাশ হয়েছে ভাবছেন। সর্বনাশ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি কি করলেন?

৫. বুদ্ধদেব পুণ্ডরীকাক্ষকে যে কথাগুলো বলেছিলেন তা নিজের ভাষায় বল।

৬. কুসংস্কার বলতে কি বোঝ? যে কোন একটি কুসংস্কারকে যুক্তি দিয়ে ভুল বোঝাও।

হঠকারিতার বিরুদ্ধে

হঠকারিতা : অবিবেচনার সঙ্গে কোন কাজ করা, ভালমন্দ না বুঝে গোঁয়ার্তুমি করা, অবিমৃষ্যকারিতা।
সরোবর : জলাশয়।
ছক : রীতি, নির্দ্ধারিত পরিকল্পনা।
সত্যি বুড়ো : শুধু বয়সে নয় অভিজ্ঞতাতেও সে বড়
মুস্কিল : বিড়ম্বনা, সমস্যা।
প্রকোপ : বিষম ক্রোধ।
ওষ্ঠাগত : ঠোটের কাছে চলে এসেছে। আর একটু হলেই মারা পড়ব।
অক্ষত : অনাহত। আঘাত টাঘাত না-পাওয়া।
দু-পেয়ো : দু-পায়ে চলে ফেরে যারা।
সওদাগর : বণিক।
সুগঠিত : সুন্দরভাবে গড়ে ওঠা। সুবিন্যস্ত।
সুস্বাদু : সুন্দর স্বাদযুক্ত।
বঞ্চিত হত : হারাত।
আহ্লাদিত : আনন্দিত।

১. ঘোড়ারা কোথায় বাস করত? তাদের সেখানকার জীবনযাত্রা বর্ণনা কর। তা দেখে তাদের সর্দ্দার কি কি ভাবত?

২. বুড়ো সর্দ্দার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনে মনে কি ভাবত? তার আগ্রহ ও অস্বস্তির কারণ ছিল কে? কেন?

৩. ঘোড়াদের দ্বীপে ঝড়ের রাতের বর্ণনা দাও। তরুণ ঘোড়াটি কি ভাবে সর্দ্দারের ওপরে জয়ী হল?

৪. সর্দ্দার তরুণ ঘোড়াটির বেড়িয়ে যাওয়াকে কি বলে সমর্থন করেছিলেন? পরে তাকে কি বলেছিলেন।

৫. ঝড়ের পরদিন সকলে নতুন কি দেখল ঘোড়ার দল। তরুণ খোড়া ও সর্দ্দারের বিরোধের বর্ণনা কর।

৬. সওদাগরদের দেশ ছিল কোথায়? সেখানে কি কি ঘটনা ঘটেছিল। সে আবার দ্বীপে ফিরে এল কেন?

৭. কার হঠকারিতায় ঘোড়ার দল কিভাবে ধরা পড়ল? সওদাগর তরুণ ঘোড়ার পিঠচাপড়ে কি বললেন?

৮. হঠকারিতা কাকে বলে? হঠকারিতার বিপদ সম্পর্কে একটি গল্প বল।

হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে

হৃদয়হীনতা : নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা অন্যের জন্য করুণাময় না হওয়া।

জ্যোতির্বিদেরা : যারা গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন।

সম্পর্কিত ভাই : ততো ভাই।

সুসমাচার : নির্দ্দেশ, বাণী, তত্ত্ব

প্রত্যাদেশ : গোপন নির্দ্দেশ।

গল্পচ্ছলে : গল্পের আকারে।

শুশ্রূষা : সেবা

সমস্বরে : একসঙ্গে, একই রকম স্বরে।

আত্মধিকারে : নিজের প্রতি বিরাগে বা ঘৃণায়।

প্রায়শ্চিত্ত : কোন পাপ বা অন্যায় করার জন্য নিজের ইচ্ছায় যে শাস্তি নেওয়া হয়।

প্রতিবেশী : আশেপাশে বাস করে যারা।

দস্যুতস্কর : চোর ডাকাত।

দলবদ্ধভাবে : দল বেঁধে।

১. যিশুখৃষ্টের বাল্যকাল বর্ণনা কর। কেন রাজা রাজ্যের অল্প বয়সের সব শিশুকে হত্যার নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন।

২. যিশু কোন্ গ্রন্থের কোন্ অংশ মুখস্থ করেছিলেন। তিনি কার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন? তাঁর শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনে তার কি মনে হতে থাকে?

৩. যিশু কি ভাবে তাঁর বাণী প্রচার করতেন। তাঁর বক্তব্য কি ছিল? কি ভাবে খাঁটি মানুষ হওয়া যায়।

৪. ক্রুদ্ধ জনতা কি করছিল? যিশু কি কৌশলে তাদের নিরস্ত করলেন?

৫. এক উকিল কি জন্য যিশুর কাছে এসেছিল? সে কি প্রশ্ন করে ছিল? যিশু কি উত্তর দিলেন? তখন উকিল কি বলল?

৬. 'কাকে তোমার প্রতিবেশী বলে মনে হল? একথা কে কাকে জিজ্ঞাসা করেন? সে কি উত্তর দিল?

৭. হৃদয়হীনতা প্রকাশ পায় এমন একটি গল্প বল।

শত্রুর বিরুদ্ধে

সিদ্ধিলাভ : কোন কার্যে সাফল্যলাভ। এখানে ধর্ম সাধনায় ঈশ্বরের সাক্ষাৎলাভ

স্মরণ : মনে মনে ভাবা।

নির্যাতন : অত্যাচার, পীড়ন।

জনারণ্যে : মানুষের বনে, বহু মানুষের মধ্যে।

জোটবদ্ধ : একত্রিত।

ঐস্লামিক : ইশ্লামীয়।

সংবর্দ্ধিত : উপযুক্ত সম্মান দেখান হয়েছে, থাকে।

মসজিদ : মুসলমানদের প্রার্থনা গৃহ।

অপরিসীম : যার সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না।

অভিযান : বিশেষ উদ্দেশ্যে সদলে বা একা যাত্রা।

নিষ্ঠুর : দয়া-মায়া শূন্য।

প্রতিধ্বনি : দূরে কোথাও ধাক্কা খেয়ে কোন ধ্বনি তরঙ্গ ফিরলে তাকে প্রতিধ্বনি বলে।

১. কবে মহম্মদ মদিনায় যান? তাঁর মদিনা যাওয়ার কারণ কি কি? ঐ দিনটি কিভাবে স্মরণীয় হয়েছে?

২. কোথায় প্রথম মসজিদ গড়ে তোলা হয়? কে গড়েন? কারা তাকে সাহায্য করে? মসজিদের বৈশিষ্ট কি ছিল?

৩. খোরস কে ছিলেন? তিনি কিসের আয়োজন করেছিলেন? সাধারণ মানুষেরা কি করে ছিল?

৪. লোকজন পাহাড়ের দিকে ছুটছিল কেন? তখন একজন কি বলেছিল? অন্যজন তখন কি বলে সাবধান করেছিল? এর ফল কি হল?

৫. কে ছুটতে পারে নি? কেন? কে তাকে তুললেন? কিভাবে তার শুশ্রূষা করলেন?

৬. মহম্মদ ও বুড়ির ঘটনাটি নিজের ভাষায় বল।

৭. খোরেস কিভাবে মহম্মদের ভক্ত হল?

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে

অস্পৃশ্যতা : কোন কোন মানুষকে ছোঁয়া যায় না এমন ভাব। কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অদ্ভুত কল্পনা করার ভাব।

সত্যদৃষ্টি সম্পন্ন : সত্য দেখবার মত মানসিকতা আছে যার।

সমর্থন : প্রতিশোষণ, পক্ষ অবলম্বন।

পরাস্ত করেন : হারিয়ে দেন।

ব্রাহ্মণ্যমতের : ব্রাহ্মণদের প্রবাহিত মতের।

চণ্ডাল : একশ্রেণীর তথাকথিত অস্পৃশ্য মানুষ। সাধারণ ভাবে শ্মশানে মৃতদেহ দাহকার্য করে থাকে।

অদ্বৈতবাদী : শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে জগতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নেই।

অবভেদ : পার্থক্যশূন্য।

দীক্ষিত : দীক্ষা নিয়েছেন যিনি।

ধ্যানস্থ : ধ্যানে মগ্ন।

বেদান্ত : ব্যাসদের রচিত ব্রহ্মবিষয় দর্শনগ্রন্থ।

পরমাত্মা : মূল সকল জীবের আত্মা যার অংশ।

গ্রাম্যচাষী : গেঁয়ো কৃষক।

পঞ্চবটী : পাঁচ রকম গাছ (অশ্বথ, বট, বিশ্ব, আমলকী ও অশোক) দিয়ে ঘেরা সাধনার স্থান।

ক্রমাগত : অনবরত।

পরিব্রাজক : সাধারণ অর্থ ভ্রমণকারী। কিন্তু এখানে চতুর্থ আশ্রম অবলম্বনকারী সন্ন্যাসীকে বোঝান হয়েছে।

দক্ষিণাত্য : দক্ষিণভারত বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ দেশ।

আলোড়িত ; আন্দোলিত।

এক ছিলুম : এক ঠান।

১. অস্পৃশ্যতা বলতে কি বোঝ? এখানে কার গল্প বলা হয়েছে? কার কার গল্প?

২. শঙ্করচার্য আজ থেকে কত বছর আগে জন্ম গ্রহণ করেন? তিনি বুদ্ধদেব থেকে কত আগে বা পরে জন্মান?

৩. শঙ্করাচার্যের জন্মের সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা কেমন ছিল? বৌদ্ধদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন ছিল? কোথায় কি কি নামে তিনি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন?

৪. চণ্ডাল ও শঙ্কারার্যের কাহিনী নিজের ভাষায় বল।

৫. শঙ্করাচার্যের বিখ্যাত শ্লোকের নাম কি? প্রত্যেক শ্লোকের শেষে কি লেখা আছে?

৬. রামকৃষ্ণদেব কিভাবে ঈশ্বর সাধনা করেন? সাধনা করে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণা কি দাঁড়ায়?

৭. রামকৃষ্ণদেবের অন্যতম গুরুর নাম কি? গুরুর কোন আবরণে তিনি হেসেছিলেন?

৮. যে ঘটনার থেকে তোতাপুরী আর অস্পৃতা মানতেন না, সেই ঘটনাটি বর্ণনা কর।

৯. পরিব্রাজক বলতে কি বুঝ? কখন নরেন্দ্রনাথ পরিব্রাজকের মত ঘুরে ছিলেন? তখন তাকে লোকে কি বলে চিনত?

১০. স্বামীজীর তামুক খাওয়ার ঘটনাটি বর্ণনা কর।

ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে

ধর্মান্ধতা : ধর্ম নিয়ে আবেগে বিচার বুদ্ধি হারিয়ে অন্ধের মত আচরণ করা।

সত্যনিষ্ঠ : সত্যের প্রতি নিষ্ঠা যার।

দোর্দণ্ড : প্রবল প্রতাপশালী

সর্বে সবা : সব কিছু।

বিশ্ববিখ্যাত : পৃথিবী জোড়া খ্যাতি যার।

যুক্তিবাদী : যিনি সব কিছু যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে জানতে এবং মানতে চান।

বিশ্লেষণ : চিড়ে চিড়ে বিচার করা।

বিশ্বস্ত : বিশ্বাসী।

হাত কামড়ালেন : অনুশোচনা করলেন।

নিষিদ্ধ করা হল : ঐ বইটি পড়া, ছাপান বা প্রচার করা বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হল।

বিরুদ্ধ-সত্য : উল্টো কথা যারা বলছে তাদের বক্তব্য। উল্টো মত।

আগুন যে রয়েই গেল : যাকে সর্বনাশা ভাবা হচ্ছে তা বেঁচেই থাকল।

বিস্তারিত ভাবে : অনেক বড় করে।

হদিশ : সন্ধান।

সৃষ্টিতত্ত্ব : কিভাবে পৃথিবী ও প্রাণীকুলের জন্ম হয়েছে যে বিষয়ে বক্তব্য।

দুর্ভিক্ষ : যখন ভিক্ষাচাইলেও পাওয়া যায় না।

উপবাসী : না খেয়ে আছে যে।

বিচলিত : চঞ্চল, আতঙ্কিত।

কৃতকর্ম : যে কাজ করা হয়েছে।

ইনকুইজিশন : ধর্মীয় বিচারালয়ে বাইবেলের নিয়ম মেনে বিচার।

বিচার পতি : বিচারক।

সীমাবদ্ধ : সীমার মধ্যে বদ্ধ।

১. ধর্মান্ধতা কথাটির অর্থ কি? এই গল্পে কাদের ধর্মান্ধতার কথা বলা হয়েছে? তারা কি নিষ্ঠুর কাজ করে ছিলেন?

২. কোপারনিকাস কে? তিনি কি আবিষ্কার করে করেছিলেন? তা কাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন?

৩. ব্রুণোর পুরো নাম কি? তিনি কত সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর জন্মপ্রসঙ্গে আর এক বিজ্ঞানীর নাম বলা হয়েছে কেন?

৪. কোপারনিকাস কি ভাবে চার্চের কর্তাদের ঠকিয়ে ছিলেন? তারা কি ভাবে শোধ নিল?

৫. ব্রুণোর বাল্যকাল সম্বন্ধে কি জানা যায়? তার সঙ্গে চার্চের সম্পর্ক তৈরি হল কি ভাবে?

৬. চার্চের লোকেরা ব্রুণো কি করতেন?

৭. দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নিয়ে ব্রুণো কি করল? পড়ে সে কি বলল?

৮. ব্রুণো তার বন্ধুকে কি বলে ছিল? তার ফল কি হল?

৯. ব্রুণো তার বন্ধুকে কি বলেছিল?

১০. ব্রুণোও কোপারনিকাসের বক্তব্যের পার্থক্য দেখাও।

১১. কিভাবে ব্রুণোকে গ্রেপ্তার করা হয়? কিভাবে বিচার হয়?

১২. ব্রুণোর মৃত্যু দৃশ্য বর্ণনা কর।